স্মৃতির অবগাহনে

ডঃ শফিক আহমদ খান
স্মারকগ্রন্থ

স্মৃতির অবগাহনে

ডঃ শফিক আহমদ খান স্মারকগ্রন্থ

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ–
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারংবার
চিহ্ন তব পড়ে আছে তুমি হেথা নাই।

স্মৃতির অবগাহনে
ডঃ শফিক আহমদ খান স্মারকগ্রন্থ

SMRITIR ABOGAHANE DR. SHAFIQUE AHMED KHAN SMARAKGRANTHA.

প্রকাশকাল
৫ই জুন, ১৯৯৫ সন
২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২ সাল

প্রকাশনায় ও সম্পাদনায়
মিসেস নূরজাহান শফিক
কস্‌বা হাউস
১২৩, নূর আহমদ সড়ক, চট্টগ্রাম।

সহযোগিতায়
স্বপন চক্রবর্তী
৩১, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম।

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশিকার

প্রচ্ছদ
দোলা ও নন্দন

কম্পিউটার কম্পোজ
অক্ষর
৩৯৩, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ২২৭০১৬

মুদ্রণ
ক্লাসিক প্রিন্টার্স
৩৭৮, সিরাজদৌল্লা রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন : ২২৭১৯৬

শুভেচ্ছা মূল্য
একশত টাকা মাত্র

প্রয়াত ডঃ শফিক আহমদ খানের
পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত

সম্পাদকীয়

অধ্যাপিকা সালমা চৌধুরী

জীবন মানেই একরাশ স্মৃতি। এ স্মৃতি কখনো বড় সুখের, কখনো বড়বেশী দুঃখেরও। স্মৃতি একান্তই অতীত। অনুভবের গভীরে বসে কখনো হাসায়, কখনো কাঁদায়। আর 'তুমি-আমি'কে ঘিরে যে স্মৃতি, সে-ই বোধহয় জীবনের সবচাইতে মধুর। তাই এই 'তুমি-আমি'র একজন যখন থাকে না, তখন দুঃসহ যন্ত্রণায় অন্তরবিদীর্ণ হয়ে যায়। জীবন ভরে ওঠে নীল শূন্যতায়। হৃদয়ের সবুজ অরণ্য বিবর্ণ হয়ে যায়। বাঁধভাঙ্গা অশ্রু হৃদয়ের গনগনে আগুনকে প্রশমিত করার জন্য ঝরতে থাকে অবিরত। তবু উত্তাপ কমে কি? কমে না। আর কমেনা বলেই সৃষ্টি হয় বিস্ময়কর স্মৃতি সৌধ 'তাজমহল'। রচিত হয় অমর মহাকাব্য 'মেঘদূত' ইত্যাদি।

মানিক ভাবীর বুকেও সেই উত্তপ্ত আগুন। প্রিয়তম স্বামীর অকালে অনন্ত বিচ্ছেদ। তাঁর দু'চোখে দিয়েছে অশ্রুর বন্যা।

বন বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ডঃ শফিক আহমদ খান। যাঁকে আমরা 'মানিক ভাই' বলে ডাকতাম। অত্যন্ত মেধাবী ডঃ খান সংশ্লিষ্ট মহল ছাড়াও দেশে বিদেশে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার স্ফুরণ ঘটিয়েছিলেন।

একাধারে তিনি ছিলেন প্রেমময় স্বামী, স্নেহশীল পিতা, কর্তব্যপরায়ণ সন্তান, দরদী ভাই, সৎ কর্মী এবং অত্যন্ত সুন্দর মনের এক বিনয়ী পুরুষ।

তাঁকে কখনো রাগ করতে দেখিনি আমরা। শান্ত অথচ প্রচুর প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিলেন তিনি। অসীম সাহসী মানিক ভাই মৃত্যুর কাছে এতটুকু মাথা নত করেননি। তাই মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মাত্র ১৫ দিন আগে পালন করে গেলেন শেষ বিবাহ বার্ষিকী। স্ত্রীর জন্য উপহার কিনে আনালেন। মিষ্টি মুখ করালেন হাসপাতালের সবাইকে। এ সবই হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালের অবস্থানকালীন ঘটনা।

কি অপূর্ব জীবনবোধ! কি সুগভীর ভালোবাসা প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি!!

শ্রদ্ধেয় মানিক ভাই-এর বিস্ময়কর স্মৃতি বিজড়িত "স্মৃতির অবগাহনে" সংকলনটি প্রসংগে আরও দু'টো কথা বলা একান্ত সমীচীন বলে মনে করি। প্রথমতঃ সংকলন প্রকাশনার দায়িত্ব মানিক ভাবী সম্পূর্ণ একক ভাবেই করেছেন বলতে গেলে। আমি দেখেছি প্রায়শঃ কারো না কারো কাছে গিয়ে অনুরোধ করছেন লেখা দেবার জন্য। একবারে না হলে বারবার গিয়েছেন। কোন রকম পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডিত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা--এটা নিঃসন্দেহে সকলের প্রশংসার দাবীদার।

দ্বিতীয়তঃ এ সংকলনকে মানিকদার পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ বলা যাবে না। তাই আমরা একাগ্রচিত্তে স্বীকার করি তাঁর বহু জানা-অজানা তথ্য এ প্রকাশনার বাইরে রয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

তৃতীয়তঃ যাঁরা হৃদয়ের গভীরতম আবেগ থেকে যেসব স্মৃতিচারণ করেছেন তা যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রেখেই মুদ্রিত করার চেষ্টা করেছি।

সাহিত্যিক বিকাশ ও দর্শন আমাদের কাম্য, কিন্তু তার চেয়ে বেশী ছিল আন্তরিকতার পরশ পাওয়া এবং আমরা তা পেয়েছি। অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁদের সবাইকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

চতুর্থতঃ নানা কারণে সংকলনটি প্রকাশে কিছুটা দেরী হল। এই অপারগতার জন্য সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

পঞ্চমতঃ স্মারকগ্রন্থের রচনাগুলো বয়সের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাজানো হয়নি। পাঠককে একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি দিতে এই প্রচেষ্টা।

এ গ্রন্থটি কতখানি সার্থক হয়েছে জানি না। তবে এটিকে নিখুঁত করার সমস্ত আন্তরিকতা নিয়েই আমরা কাজ করেছি। যদি কোথাও কোন ত্রুটি বা মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে থাকে তার জন্যে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

মানিক ভাই চলে গেছেন চির আনন্দের দেশে। এ গ্রন্থটি আমাদের সকলের মাঝে তাঁর স্মৃতিকে চির জাগরুক রাখবে। তাঁর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রেরণা জোগাবে আমাদের উত্তরসুরীদের মাঝে। এ প্রত্যাশা নিয়েই আজকের এ উদ্যোগ। প্রত্যাশা পূরণ হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

সবশেষে নিবেদন করছি তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

সূচীপত্র

ডঃ শফিক আহমদ খান স্মারকগ্রন্থ

পরম স্নেহাস্পদ মানিকের স্মরণে	১০	বেগম সুফিয়া কামাল
মানিকের স্মৃতিচারণ	১১	ডঃ মইনুদ্দিন আহমদ খান
ডঃ শফিক আহমদ খান স্মরণে	১৪	অধ্যাপক হায়াত হোসেন
ডঃ শফিক খান স্মরণে	১৬	সৈয়দ আবদুর রহমান
ডঃ শফিক আহমদ খানকে যেমন দেখেছি	১৮	প্রফেসর (ডঃ) আবদুর রহমান
'জীবন' প্রয়াত ডঃ খান স্মরণে	১৯	জায়েদ হোসেন ভূঁইয়া
ডক্টর শফিক আহমদ খান	২০	অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলাম
In memory of a very good friend	২১	Prahlad K. Manandhar
ডঃ শফিক আহমদ খান স্মরণে	২২	ডঃ মীর মোহাম্মদ হাসান
ডঃ শফিক আহমদ খানের স্মৃতিচারণ	২৪	ক্যাপ্টেন এম. জি. হোসেন, বি.এন.
'মানিক' প্রিয় ভাইটি আমার	২৫	জাহানারা ইসলাম (জুবলী)
আমার বাবাকে যেমন দেখেছি	২৬	নিয়াজ আহমদ খান (রানা)
ডঃ শফিক আহমদ খান স্মরণে	২৮	মুন্সী আনোয়ারুল ইসলাম
'মানিকদা' স্মরণে	৩২	ডাঃ এল. এ. কাদেরী
তোমারে হারায়ে খুঁজি	৩৩	দীন মোহাম্মদ মানিক
একজন ভাল মানুষের স্মৃতিকথা	৩৬	আলী আকবর কোরেশী
শফিককে স্মরণ করি	৩৭	লুৎফর রহমান
মেধা ও সততার বিশুদ্ধ সমন্বয় ঃ 'মানিক মিয়া'	৩৯	হেলাল হুমায়ুন
'মানিকদা' যেমন ছিলেন	৪১	আমিন আহমদ খান
ডঃ শফিক আহমদ খান স্মরণে	৪৪	ডঃ মোহাম্মদ কামাল হোসাইন
ডঃ শফিক আহমদ খান স্মরণে	৪৬	এ. এম. এম নুরুল আলম
আমার প্রিয় আব্বু	৪৭	জাহিদ আদনান খান (রুবাব)
In memory of Dr. S. A. Khan	৪৮	Nurul Islam Hawladar
স্মৃতির পাতা	৫০	মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন
আমার দেখা ঃ ডক্টর শফিক আহমদ খান	৫৩	মহিবুল হক
আমার দেখা বাবাকে	৫৬	নাফিস আহমদ খান (রজত)
ডঃ শফিক আহমদ খান ঃ আমাদের সাহস ও প্রেরণার উৎস	৫৮	হেলালউদ্দিন মোঃ আলমগীর
Shafique Khan As I knew him	৬১	S. A. Imam
ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা	৬৩	শাহনূর আহমদ খান (রনী)
নাইরোবীতে ডঃ শফিক আহমদ খান	৭০	আফজালুর রহমান
অতি চেনা 'মানিকদা'	৭৩	নাজমা মুস্তাফা
ডঃ শফিক আহমদ খান ঃ তাঁকে যেমন দেখেছি	৭৪	মুহম্মদ আবুল মনসুর
যে স্মৃতি ভোলা যায় না	৭৬	শহীদ আহমদ খান (মন্টু)
স্মৃতিপটে ডঃ শফিক খান ঃ একজন কর্মচঞ্চল দায়িত্বশীল ও জ্ঞানানুরাগী প্রাণ-পুরুষ	৮০	সেলিম আজম
ডঃ এস. এ. খানকে যেমন দেখেছি	৮৩	মতলুবুর রহমান চৌধুরী
স্মৃতির সঞ্চয় হতে	৮৬	রেহনূমা খান (দোলা)
পরম শ্রদ্ধাভাজন মামা	৯১	নন্দন
চট্টলার কৃতি-সন্তান ডঃ শফিক আহমদ খান	৯২	মোঃ সাহাব উদ্দিন
আমাদের 'মানিকদা'	৯৪	মরিয়ম রহমান (বেণু)
স্মৃতি কথা	৯৭	এস. এম. সিরাজুল হক
স্মৃতি অম্লান	৯৯	এ. এইচ. এম মঞ্জুরুল করিম
স্মৃতির অবগাহনে	১০৪	মিসেস নূরজাহান শফিক
জীবন পঞ্জি	১১০	ডঃ শফিক আহমদ খান
স্মৃতি অ্যালবাম	১১৪	ডঃ শফিক আহমদ খান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
এবং
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাণী

চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান প্রয়াত বন সংরক্ষক ডঃ শফিক আহমদ খানের স্মরণে তাঁর গুণমুগ্ধ ব্যক্তিবর্গ তাঁর জীবন ভিত্তিক একটি সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

গুণীজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের সকলের সামাজিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সমাজ প্রাণরসে সিক্ত হতে পারে বলেই সে উর্বর ভূমিতে বহু গুণীজনের আবির্ভাব ঘটে থাকে।

ডঃ শফিক আহমদ তাঁর জীবনের বহুবিধ মানবিক গুণাবলীতে এলাকাবাসীদের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন বলেই আজ তারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত। এটা মানব জীবনের এক দুর্লভ প্রাপ্তি বলে আমি মনে করি।

আমি মরহুম শফিক আহমদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং যারা এ কৃতি সন্তানের স্মরণে সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন তাদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

আমি সংকলনটির সুষ্ঠু সম্পাদনা ও মনোরম প্রকাশনা কামনা করি।

আবদুল্লাহ-আল-নোমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পবিত্র 'কোরআন'- এর ভাষায় "কুল্লু নফ্‌সিল্ জাএকাতিল্ মওত্" । মৃত্যু একটি অমোঘ নিয়ম, এর ব্যতিক্রম নেই। আবার কিছু ব্যক্তির অন্তর্ধান এমনই নাড়া দেয় যে, তা ভুলবার নয়। ডঃ শফিক আহমদ খান তেমনই একজন ব্যক্তিত্ব।

ডঃ খানের মৃত্যুতে আমরা শোকাভিভুত। তাঁর মৃত্যুতে বন বিভাগ সর্বোপরি দেশ একজন কৃতি সন্তানকে হারিয়েছে। জীবিত থাকাকালীন ডঃ খানের অনেক কৃতকর্ম আমাদের কর্মজীবনের সহায়ক হবে এবং ভালো কাজের অনুপ্রেরণা যোগাবে। মৃত্যুর বাস্তবতা সবাইকে মানতে হবে। কিন্তু ইহজীবনের কর্মকান্ড একটি মানুষকে অমর করে রাখতে সহায়তা করে। ডঃ শফিক খান তার কর্মময় জীবনের কর্মকান্ড দিয়ে আমাদের মাঝে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

ডঃ খান একজন সদা হাস্যোজ্জল অমায়িক ব্যবহারের ব্যক্তি ছিলেন। যে কোন আপদকালীন মুহূর্তেও তিনি অটল এবং অবিচল থেকে অত্যন্ত স্থির চিত্তে বিপদ মোকাবেলা করতেন। তিনি অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। এটি তার একটি অনন্য গুন। তাই তিনি কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলের প্রিয় ভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মৃত্যু আমাদের সকলকে ব্যথিত করেছে। আমি তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করি। আমি তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারকে জানাই সমবেদনা।

ডঃ শফিকের জীবন-ভিত্তিক একটি সংকলন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিঃসন্দেহে এটি একটি মহৎ উদ্যোগ। এ সাথে এ' মহৎ উদ্যোগের সহযোগী সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এম.এন.এ.কাতেবী
প্রধান বন সংরক্ষক,
বাংলাদেশ।

২৫শে জুলাই '৯৩

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

শাখা-২

শোক প্রস্তাব

ঢাকা, ৮ই আষাঢ় ১৩৯৯/২২শে জুন ১৯৯২

নং শা-২/পবম-৪২/৯২/২৮১-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গভীর দুঃখের সংগে জানাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত বন সংরক্ষক ডঃ শফিক আহমদ খাঁন বিগত ৫-৬-১৯৯২ / ২২-২-১৩৯৯ তারিখ অপরাহ্ন ১২-১০ মিনিটের সময় দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বৎসর ৫ মাস।

২। ডঃ শফিক আহামদ খাঁন ১৯৩৭ সনের ১৩ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৬০ সনে জৈব-রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৬৩ সনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সিনিয়র ফরেস্ট সার্ভিসে সহকারী বন সংরক্ষক হিসাবে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সনে তিনি উপ-বন সংরক্ষক পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১৯৮২ সনে যুগোশ্লাভিয়ার সারায়েভো বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফরেস্ট্রীতে ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর পূর্বে তিনি বন অধিদপ্তরে ভারপ্রাপ্ত বন সংরক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন।

৩। চাকুরী জীবনে ডঃ শফিক আহামদ খাঁন একজন সদালাপী, বিনয়ী ও কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার পুত্র ও এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ডঃ শফিক আহামদ খাঁনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ
সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ।

পরম স্নেহাস্পদ মানিকের স্মরণে

বেগম সুফিয়া কামাল

একটি চারা গাছকে ছায়া দিয়ে, মায়া দিয়ে, মমতা দিয়ে যত্ন করে বড় করে তুললে তা'তে যখন ডালে ডালে পাতায় ও ফুলে ফলে ভরে উঠে তখন তার জন্য আনন্দ, গৌরব লাভের আশা কেনা করে!

আবার যখন সযত্ন, সস্নেহ লালিত সেই ফলবান বৃক্ষটি সবার অগোচরে মূলে কীট দ্রষ্ট হয়ে ঝরে পড়ার রূপ নেয়, তখন যে কী কষ্ট, কী যন্ত্রণা বোধ হয় তারও কী কোন সীমা থাকে? সে ব্যাথার, সে যন্ত্রণার, সে দুঃখ প্রকাশ করার ভাষা আর থাকে না।

তেমনি দুঃখ যন্ত্রণা বিষাদ নিয়ে কিছু লেখার সাধ্য আমার নেই। আমাদের পরিবারে সর্বজন প্রিয়, সন্তান বৎসল, বন্ধু, স্বজন, সবার আপনজন সদানন্দময় শফিক আহমদ খান, আদরের 'মানিক" কে নিয়ে কিছু লিখতে চাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে কিছুই আমি লিখতে চাইনি, পারিও না। শিক্ষায়, চরিত্রে, স্বাস্থ্যে, কর্মময় সুন্দর জীবন যাপন করতে করতে তার জীবনে যে অকাল মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে, এ কথা কল্পনাও করা যায়নি। ছোটবেলা থেকে তার লেখাপড়া, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক সাহচর্য্য, কর্মঠ জীবন সবদিক দিয়ে আমাদের পরিবারের প্রত্যেকের কাছেই আনন্দদায়ক, আদরনীয় ছিলো। মা, বাবা, ভাই বোন ও আত্মীয় স্বজন এবং সহকর্মীদের কাছেও তার অমায়িক ব্যবহার, কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততার জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মনে হয় না, ভাবা যায় না, সকলের যত্নে, আদরে প্রচেষ্টায় সুচিকিৎসায় ও তাকে বাঁচানো গেল না। তার জীবনে সে যত জনার সাথে মেলামেশা করেছে তারা তার অসুস্থতার সময়ে আন্তরিক চেষ্টা করেছে যাতে করে সে আরোগ্য লাভ করে, আবার যেন সহকর্মীদের সাথে একত্র হয়ে নিজ কর্তব্য করতে পারে। কিন্তু জানি না, রহমানুর রহিম আল্লাহতা'আলার কি মর্জি, সে আর কারুরই মমতার বন্ধনে, আন্তরিক আরোগ্য কামনায় বেঁচে উঠলো না। তার শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, পারিবারিক সুন্দর জীবনের মায়া তাকে পৃথিবীতে ধরে রাখতে পারল না। আজ তাই তার অভাবে, তার শূন্যতায় মর্মাহত হয়ে তার স্মৃতি রক্ষার যে আয়োজন করেছে, এতে করেই বোঝা যাচ্ছে সে মানুষটি সকলেরই কাছে কত আদরের, কত প্রিয়, কত প্রয়োজনীয় ছিলো। আমার সাধ্য নাই তার বিষয়ে কিছু বলতে। আল্লাহ্ তার সন্তানদের সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান করে রক্ষা করুন, তার পবিত্র আত্মার মাগফেরাত করুন। শোক যিনি দিয়েছেন, তার স্ত্রী লাবলুকে এ অপরিমেয় দুঃখে, তিনিই সান্ত্বনা দান করুন, এই প্রার্থনা আমার।

বন বিভাগের বড় কর্মকর্তা রূপে সে বনকে ভালোবেসে দেশকে, মাটিকে, ভালোবেসে চেয়েছিলো দূষণ মুক্ত পরিবেশে আদর্শ দেশ গড়তে। দুঃখ করে বলত বড় বড় প্লেন উঠানামার জন্য রানওয়ে, হ্যালিপ্যাড এর জন্য অজস্র বন ধ্বংস করে বনের

Shunati.com Pioneer in village based website

মাত্রা কমে গিয়ে দূষণ বেড়ে পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবার কারণ ঘটছে- তাই সে নব পর্যায়ে বনায়নের পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টাও করেছিলো- কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দেশ! কখন যে কী সুষ্ঠু পরিচালনার প্রয়োজন তা এখনও নির্ণয় না করে বিপুল অর্থ ব্যয়ে সেমিনারেই শুধু পর্যবসিত করছে। জানিনা, শফিক আহমদের দুষণ মুক্ত ঘন বনায়নের স্বপ্ন কখনও তার আদর্শ গ্রহণে বাস্তবায়িত হবে কি না। বাংলার এ মাটিতে শফিক খানের মতো দেশপ্রেম, সংস্কৃতিমনা, সাহিত্য সাধক, ধর্ম কর্মে নিষ্ঠাবান সন্তান জন্ম নিক, শফিক আহমদ তারই মধ্যে বেঁচে রইবে।

মানিকের স্মৃতিচারণ

ডঃ মঈনুদ্দিন আহমেদ খান
অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শফিক আহমদ আমার বড় চাচার ছেলে, আমার জ্যাঠাতো ভাই। বয়সে আমার থেকে এগার বছরের ছোট ছিলো। ১৯৩৭ সালে মানিকগঞ্জে শফিকের জন্ম। তখন শফিকের বাবা মরহুম কবিরউদ্দিন খান মানিকগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি ইংরেজীতে অনার্স গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। ইংরেজী, বাংলা ও ফারসী ভাষায় তাঁর জ্ঞান অনন্য সাধারণ ছিল।

বড় চাচার সাত ছেলের মধ্যে শফিক হলো চতুর্থ। মানিকগঞ্জে মানিকের মতো নাদুস-নুদুস, ফুটফুটে চেহারা নিয়ে জন্মগ্রহণ করার উপলক্ষে তার ডাকনাম রাখা হয় 'মানিক'। মানিক ছোটবেলা থেকেই প্রতিভাদীপ্ত ছিল। স্কুল জীবনে লেখাপড়ার প্রতি তার ঐকান্তিক নিবিষ্টতা দেখা যায়। দ্বিতীয়কে অনেক দূরে সরিয়ে বরাবরই সে প্রথম হত। গালগল্প করে সময় নষ্ট করা তার ধাতের প্রতিকূল ছিল। যে কোন কঠিন বিষয়ই সহজে বুঝতো ও অন্যকে বোঝাতে পারতো। এভাবে ছাত্রজীবনের প্রতিটি স্তরে তার প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়ে লাভ করেছে শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বোচ্চ ডিগ্রী। মানিক আমাদের পরিবারের গৌরব।

আমাদের পরিবার এক অনন্য ঐতিহ্যের ধারক। এই ঐতিহ্যের গোড়াপত্তন হয় ১৪০০ বছর পূর্বে মক্কানগরীর হজ্ব উদ্‌যাপন ক্ষেত্র আরাফাতের ময়দানে। হিযরী ১০ম সনের ৯ই যিলহজ্ব মোতাবেক ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহান হজ্ব উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমবেত লক্ষাধিক মুসলমানের সমাবেশকে লক্ষ্য করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অন্তিম উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর জনসমাবেশকে লক্ষ্য করে বলেন- 'তোমরা যারা উপস্থিত আছ, তারা অবশ্যই অনুপস্থিতদেরকে এই বাণী পৌঁছে দেবে।'

এ ঘটনার পর কোন সাহাবীকে নিজ বসতবাটিতে কদাচিত মৃত্যুবরণ করতে দেখা গেছে। তাঁরা আল্লাহ্‌র বাণী ও রাসুলের সুন্নতের প্রচার ও প্রসার করতে পাগলপারা হয়ে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েন এবং দেশ-দেশান্তরে পরবাসে জীবন সাঙ্গ করেন এবং পাহাড়ে-প্রান্তরে সমাহিত হন। দুনিয়া ব্যাপী তাঁদের মাজার আমরা যত্রতত্র দেখতে পাই। এরূপ দেশ-দেশান্তরী হযরত আবু বকর (রঃ)-এর বংশধর, এক সিদ্দিকী পরিবারে মানিকের জন্ম। এ পরিবারটি খ্রীষ্টীয় তের শতকের দিকে লাহোরে পদার্পণ করে। অতঃপর লাহোর থেকে পনের শতকে গৌড়ে উপনীত হয় এবং মোঘল আমলের শেষের দিকে বাংলার সুবাদার শাহ্ সুজার সাথে রাজমহলে অবস্থান করে। সর্বশেষে শাহ্ সুজা, ভাই আওরঙ্গজেব কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে আরাকানে গমন করলে, তাঁর আমাত্য কাজী আল-কুযাত, অর্থাৎ প্রধান বিচারক হাফেজ খান চট্টগ্রামে আশ্রয় নেন। অতঃপর তাঁর উত্তরসূরী কয়েক পুরুষ বাঁশখালীতে বসবাস করার পর পূর্বতন সাতকানিয়া ও বর্তমানে চুনতি গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। চুনতি গ্রাম মানিকের অবস্থান ছিল ছয় পুরুষে।

সজরা, কিংবদন্তী এবং স্মরণকালের তথ্যমূলে প্রতীয়মান হয় যে, এ ঐতিহ্যবাহী পরিবারের প্রধান অবলম্বন ছিলো জ্ঞানচর্চা। জ্ঞানচর্চায় বংশানুক্রমিক অফুরন্ত তৃষ্ণা, অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা এ পরিবারের সদস্যদেরকে বহুলাংশে জ্ঞানান্ধ করে রাখে। তাই রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে কস্মিনকালেও তাদের কেউ কৃতকার্য হয়েছে বলে দেখা যায় না। শিক্ষকতার কাজে, আধ্যাত্মিক সাধনায়, ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে সরকারি প্রশাসনিক কাজে, বিশেষত বিচার বিভাগে এবং প্রতিরক্ষামূলক সামরিক তৎপরতায় বাংলার সুলতানী আমলে, মোঘল আমলে, ব্রিটিশ শাসনামলে, এমন কি পাকিস্তান ও বাংলাদেশে, এ পরিবারের সদস্যদের তৎপরতা ও কৃতিত্ব সমানভাবে দেখা যায়।

চুনতিতে অবস্থানকালে এ পরিবারের দু'জন মহান ব্যক্তিত্ব খৃষ্টীয় ১৯ শতকের মধ্যভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁরা ছিলেন দুই সহোদর ভাই। বড়জন মওলানা আব্দুল হাকীম (রহঃ), সৈয়দ আহমেদ শহীদ (রহঃ)-এর খলিফা ছিলেন এবং বড় মৌলভী সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। ছোটজন খান বাহাদুর নাছির উদ্দিন খান ছিলেন ফার্সী কাব্যামোদী, ও মোশায়েরার ভক্ত। তিনি মোশায়েরায় অংশ গ্রহণ করতে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত চলে যেতেন। প্রথমজনের নামে চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা চুনতির মধ্যখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় জন নিজস্ব ভূমিদানে এবং উদ্যোগে চুনতির একপাশে কক্সবাজার সড়কের উপরে চুনতি ডেপুটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন।

খান বাহাদুর নাছির উদ্দিন খান ছিলেন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ডেপুটি কালেক্টর। মওলানা আব্দুল হাকীম সাহেব প্রথম জীবনে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিচারক ছিলেন। কিন্তু সরকার যখন ইসলামী শরীয়তের শাসন রহিত করে রেগুলেশন-এর মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে, তখন তিনি বিচারকার্যে ইস্তফা দিয়ে চুনতি গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। কেননা, তিনি সরকারের নিকট থেকে

যৎসামান্য জীবিকা গ্রহণ করে আল্লাহ্র ওয়াস্তে শরীয়ত মোতাবেক ন্যায়তঃ বিচারকার্য সম্পন্ন করতে প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে কোম্পানীর প্রবর্তিত আইনতঃ বিচার পরিচালনা করে নিছক চাকুরিজীবীতে পরিণত হতে রাজী ছিলেন না।

তাই চুনতি গ্রামে তিনি শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং পবিত্র কুরআন মজীদ নিজ হাতে প্রণয়ন করে হাদিয়া অর্থাৎ উপঢৌকন মূলে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীতে তাঁর বড় ছেলে ওয়াজীউল্লাহ্ খান বৃটিশ ভারতে জিলা জজের পদে নিয়োজিত হন।

কথিত আছে- মওলানা আব্দুল হাকীম সাহেব বছরে যে দু'এক কপি কুরান লিপিবদ্ধ করতেন, তা খান বাহাদুর নাসিরউদ্দিন খান চেয়ে নিতেন এবং তার পরিবর্তে যে উপঢৌকন প্রদান করতেন তাতেই তাঁর বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহ হয়ে যেত।

তাঁদের প্রভাবে চুনতি গ্রামে বিগত ছয় পুরুষ ধরে উচ্চমানের ফার্সী ও উর্দু কাব্যচর্চার ঐতিহ্য বিদ্যমান রয়েছে। চুনতি গ্রামের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উচ্চ শিক্ষার মূলে এ পরিবারের অধ্যবসায় ও অবদান অনস্বীকার্য।

যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করার লক্ষ্যে মোঘল শাসকেরা দল বেঁধে শিকার করার প্রথা প্রবর্তন করেন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা শিকারামোদী ছিলেন এবং মনসবদারী আমলের দলে-বলে শিকার করার ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন।

এ পরিবারের মুরুব্বীদের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য ছিলো মহানুভবতা ও বিদ্যানুরগের। মানুষের অনুভূতি দু'প্রকার। এক প্রকার, পঞ্চ ইন্দ্রিয়প্রসূত অনুভূতি যা লাভক্ষতি চিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এতে পশুপক্ষী ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। কেবল বুদ্ধির প্রখরতা তারতম্যের শ্রেণী-বিভক্তি আছে।

অন্য প্রকার, মহান অনুভূতি যা ভালো-মন্দ বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই মহান অনুভূতিমূলে মহানুভবতা। এ বংশের মুরুব্বীরা মদ, ঘুষ, দুর্নীতি ও দুর্নামের উর্ধ্বে অবস্থান করতে ভালোবাসতেন। নিজের চিন্তা আল্লাহ্র উপর ন্যাস্ত করে সদা-সর্বদা পরের কল্যাণ চিন্তা করতেন। এ কারণে বংশানুক্রমে তাঁরা সম্মানিত ছিলেন।

ভাই মানিক মহানুভবতা, বিদ্যানুরাগ, সততা ও ভদ্রতার মূর্ত প্রতীক ছিল। মহান আল্লাহ্র নিকট তার রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং তার পরিবার, পরিজন ও ছেলে-মেয়েদের জন্য ইহ-পরকালের সুখ সমৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

ডঃ শফিক আহমদ খান স্মরণে

অধ্যাপক হায়াত হোসেন
ডীন, কলা অনুষদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মানুষ আসে মানুষ যায় কারণ জন্ম মৃত্যু জীবনের নিয়ম কিন্তু কিছু মানুষ এতো অসময়ে এবং মনকে এমনভাবে নাড়া দিয়ে চলে যায় যে জীবনটা তখন একেবারে অনিশ্চিত ও মূল্যহীন মনে হয়। এক দুঃসহ স্মৃতিতে পরিণত হয় সেই হারিয়ে যাওয়া মানুষটি। এতো ভালো কাজ, এতো ভালো কথা, এতো ভালোবাসা, এতো ন্যায়নীতি ও উচ্চ আদর্শ সব যেন এক মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায়, নির্দয়ভাবে হারিয়ে যায়।

এভাবেই সেদিন হারিয়ে গেলেন আমাদের সবার অত্যন্ত প্রিয় এক ব্যক্তিত্ব ডঃ শফিক আহমেদ খান। উচ্চ শিক্ষিত ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী ডঃ খান ছিলেন বন বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তা (বন সংরক্ষক)। লক্ষ কোটি গাছপালা তথা দেশের মূল্যবান সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে নিবেদিত ডঃ খান শুধু নিজের জীবনটাই যেন রক্ষা করতে পারলেন না। সত্যিই এত জীবন্ত ও প্রাণবন্ত পুরুষ এমন অকালে প্রাণ হারাবেন ভাবতেই কষ্ট হয়। মৃত্যু তাঁকে যেন ছোবল মেরে নিয়ে গেছে আমাদের মাঝ থেকে। তিনি আজ বহুদূরে, অথচ মনে হয় কতো কাছে। ডঃ খানের সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের নয়, বড়জোর ১০/১১ বছরের, কিন্তু তাঁর সুঠাম দেহ ও সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে কোনদিন মনে হয়নি তাঁর আয়ু এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে। এটা সত্যিই অবিচার, এক ধরণের নির্মমতা কিন্তু প্রকৃতির এই অন্যায় ও বৈরী আচরণ ঠেকাবে সে সাধ্য কার?

মনে পড়ে ডঃ শফিক খানের ভগ্নিপতি লুৎফর ভাইয়ের রুমঘাটাস্থ বাসভবনে তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। বলতে গেলে সেদিন থিকেই তাঁর সাথে আমার একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠে। লেখাপড়া ও জ্ঞানচর্চার প্রতি তাঁর খুব ঝোঁক ছিল এবং তাঁকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি কমিটিতেও রেখেছিলাম। বন বিভাগের চাকরি তাই বিভিন্ন জায়গায় পোষ্টিং হতো বলে তাঁর সাথে মাঝে অনেক দিন দেখা হতো না। চট্টগ্রাম থাকতে তার সাথে আমার একবার কথা হয়েছিল শীতের মৌসুম আসলে তিনি আমাকে চুনতী অভয়ারন্যে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। সাথে লুৎফর ভাইও থাকবেন। এরপর হঠাৎ তিনি সিলেট বদলি হয়ে গেলেন, তবুও মনে আশা ছিল প্রোগ্রামটি একদিন না একদিন কার্যকর হবে। কিন্তু এর কিছুকাল পরই দুঃসংবাদটা পেলাম। লুৎফর ভাইয়ের স্ত্রী মরিয়ম ভাবী জানালেন ডঃ খান প্রাথমিক চিকিৎসা সেরে ব্যাংকক থেকে ফিরে এসেছেন। রোগের বিবরণ শুনে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। একসাথে বনে বেড়াতে যাওয়ার কথা আর এ কী হলো!! মানুষের ভাগ্য যে তাকে কোথায় নিয়ে যায়, সে নিজেই যে এক সময় ভাগ্যের এক অসহায় শিকারে পরিণত হয়, এটাই বা মনকে বুঝাই কী করে?

অবাক হলাম হঠাৎ একদিন ডঃ খানের টেলিফোন পেয়ে। তিনি চট্টগ্রাম বদলি হয়ে এসেছেন বলে জানালেন এবং ছেলে নিয়াজ আহমেদ খান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়ের লোক

প্রশাসন বিভাগ থেকে মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া উপলক্ষে পরের দিন দুপুরে একটি চাইনীজ রেস্টুরেন্টে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। আমি সানন্দে ওনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। পরের দিন যথা সময়ে স্ত্রী নিয়ে নির্ধারিত রেস্টুরেন্টে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অনেক লোকের সমাগম। ডঃ খানের সাথেও অনেকক্ষণ কথা বলে ভালো লাগলো এবং আশ্বস্ত বোধ করছিলাম। ওনাকে মোটেই অসুস্থ মনে হচ্ছিল না। ভাবলাম ভালো চিকিৎসা চলছে, হয়তো আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। সপ্তাহ দু'য়েক পর তিনি একদিন আমাকে অফিস থেকে আরেকবার ফোন করলেন এবং অনেকক্ষণ কথা বললেন। আমার সাথে কথা বলতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল এবং কথা বলে বেশ ভালো বোধ করছিলেন বলে তিনি জানালেন। আরও অনুরোধ করলেন সময় হলে আমি যেন একবার ওনার বাসায় বা অফিসে গিয়ে কিছুক্ষণ গল্পসল্প করি। আমিও কথা দিলাম। কিন্তু দুঃভাগ্যবশত ওটাই ছিল আমাদের শেষ কথা, দেখাও আর হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মব্যস্ততা ছাড়াও তখন আমাকে ঘনঘন কয়েকবার দেশের বাইরে যেতে হয়েছিল, বোধ করি ওনার মৃত্যুর সময়েও আমি বাইরে ছিলাম। তাই আর দেখা বা কথা হয়নি।

এভাবেই ঘটনা শেষ তবে স্মৃতি নয়। এই স্মৃতি বার বার গুমরে উঠে বুকের ভেতর, তবে লোকান্তরিত ডঃ খান লোকের অন্তরে পেয়েছেন চির ঠাঁই- এটাই শান্ত্বনা, এটাই মানুষ হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড়ো স্বীকৃতি ও সম্মান।

ডঃ শফিক খান স্মরণে

সৈয়দ আবদুর রহমান
পরিচালক
বি.এফ.আই.ডি.সি. ঢাকা।

ডঃ শফিক খান আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার স্মৃতি রয়েছে আমার মানসলোক জুড়ে। ভাবতে অবাক লাগে এই সুন্দর মননশীল প্রানোচ্ছল, আকর্ষণীয় ব্যাক্তিত্বটি হঠাৎ করেই হারিয়ে গেলেন আমাদের মাঝ থেকে। অসময়ে অবেলায়। বিষাদে মন ভরে উঠে।

ডঃ শফিক খানের সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘ দিনের। সময়টা পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল প্রাঙ্গণে প্রথম দেখা। মুগ্ধ হলাম তার আকর্ষণীয় প্রাণোচ্ছল অনন্য ব্যাক্তিত্বে। মুগ্ধ হলাম তার সুন্দর কথকতায় মনোমুগ্ধকর আলাপচারীতায়। একদিনের কথা কখনো ভুলতে পারবো না। ফজলুল হক হলের পাশের পুকুরের বাধানো ঘাটে বসে আড্ডা হচ্ছিল। আড্ডার মধ্যমনি ছিলেন সেদিনের প্রানোচ্ছল তরুন ডঃ শফিক খান। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পশ্চিম দিগন্তে রংয়ের খেলা শুরু হয়েছে। হঠাৎ আমাদের একজন তাকে অনুরোধ করল একটি রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে শোনাতে। কান পেতে আছি। সুন্দর সাবলীল কণ্ঠে বেজে উঠলো রবীন্দ্র নাথের এক অবিস্মরণীয় গান ঃ

'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা,
তুমি আমার সাধের সাধনা,
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা,
তুমি আমারই.........'

এ গানের বাণী আর সুর মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল আসন্ন সন্ধ্যার নীরব পরিবেশের সাথে। আবেগে আপ্লুত হল মন।

ষাটের দশকের শুরুতে আবার দেখা পেশাওয়ারের বন বিদ্যালয়ে। এখানে দীর্ঘ একটি বছর তার সংগ পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বাংলার সবুজ শ্যামলীমা থেকে অনেক দূরে পেশাওয়ারের রুক্ষ উষর পরিবেশে চলছে আমাদের কঠোর প্রশিক্ষণ। এর মাঝে ডঃ শফিক খানের সাহচর্য্য ছিল যেন মরুভূমিতে মরুদ্যানের মত। তার আকর্ষণীয় আলাপচারিতা, গল্প আর গানে মুখরিত হয়ে উঠত আমাদের সংক্ষিপ্ত অবসর মুহূর্তগুলো।

তার পর চাকুরী জীবনে তাকে পেলাম সহকর্মী রূপে। কখনো দূরে, কখনো কাছে। চাকুরী আর সংসার জীবনের নানা ঝামেলায় আমরা অনেকটা নিষ্প্রাণ আর নীরস হয়ে উঠলাম। কিন্তু ডঃ খান রয়ে গেলেন তেমনি প্রানোচ্ছল আর রসময়। তাঁর রসবোধ ছিল

এমন প্রখর যে তার উপস্থিতি আর আলাপচারিতা বিষন্ন পরিবেশকেও করে তুলতো সরস আর উপভোগ্য।

ডঃ শফিক খানের হৃদয় ছিল মানবিক গুণাবলীতে পূর্ণ। তিনি ছিলেন উদার, মহৎ। তিনি ছিলেন সবার বন্ধু এবং মংগলাকাংখী। সাহায্য সহযোগীতার হাত সবার দিকে বাড়িয়ে দিতে তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত। দুঃখ আর বিপদের দিনে তিনি ছিলেন প্রকৃত বন্ধু।

ডঃ শফিক খান ছিলেন একজন সংস্কৃতিবান সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি। সংসারের নানা ঝামেলায় আমরা যখন সংস্কৃতির জগৎ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি তখনও তিনি সংস্কৃতির চর্চা করেই চলেছেন। ভাল বই কেনা আর পড়া আমারও এক সময় নেশা ছিল। সাম্প্রতিককালে এ নেশায় একটু ভাটা পড়েছিল। সমকালীন লেখকদের অনেক বই পড়ার সুযোগ আমার হচ্ছিল না। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন এলেন ডঃ শফিক খান। কথা প্রসংগে বল্লেন আমি বুদ্ধদেব গুহের একটি বিশেষ বই পড়েছি কিনা। জানালাম বইটি আমার পড়ার সুযোগ হয়নি। কিছুদিন পরেই তিনি আবার এলেন। উপহার হিসেবে নিয়ে এলেন ঐ বিশেষ বইটি। তিনি নিজের সংস্কৃতিবোধকে লালন করেই ক্ষান্ত হতেন না। অপরের সংস্কৃতি বোধ জাগিয়ে রাখার প্রেরণা যোগাতে তিনি ভালবাসতেন।

ফুল ফোটে, সৌরভ বিলায় আর ঝরে যায়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তবু প্রশ্ন থাকে। সবচেয়ে সুন্দর আর সুবাসিত ফুলটি কেন অসময়ে সবার আগে ঝরে যাবে? এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। ডঃ শফিক খান নিতান্ত অসময়ে আমাদের ছেড়ে গেছেন। কিন্তু তার স্মৃতি আমাদের সবার মনে চির অম্লান হয়ে আছে এবং থাকবে।

ডঃ শফিক আহমদ খানকে যেমন দেখেছি

প্রফেসর (ডঃ) আবদুর রহমান
আই.এফ.সি.ইউ

ডঃ শফিক আহমদ খাঁন, ভূতপূর্ব ভি সি এফ, বাংলাদেশ বন বিভাগ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটে একাধিকবার ডেপুটেশনে কর্মরত ছিলেন। ঐ সময় আমিও উক্ত ইনষ্টিটিউটে কতর্ব্যরত ছিলাম। জনাব খাঁনের সমকালীন আরও বেশ কয়েকজন ডি সি এফ এবং এ সি এফ ও দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটে কর্মরত ছিলেন। নানাবিধ কারণে ডঃ খানের সহিত আমার আত্মার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে। সে জন্য ডঃ খাঁনকে আমার বেশ ভাল লাগতো। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন কিছু গুণ থাকে যা তাকে অন্যান্যদের থেকে বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র দান করে। ডঃ খানের মধ্যে বেশ কিছু গুণের সমাবেশ ছিল যার মধ্যে আমার কাছে বিশেষভাবে ভাল লাগতো তাঁর সদা হাসি খুশি স্বভাব ও স্থির দৃঢ়তার সাথে সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মনোবল। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটে অবস্থান কালে ডঃ খাঁন যে কর্তব্য সচেতনাতার পরিচয় দিয়াছেন তা খুব পরিষ্কারভাবে প্রতিয়মান হয় সমকালীন সিলভিকালচারাল রিসার্চ ডিভিশনের বিভিন্ন ষ্টেশন ও সাব ষ্টেশনের কার্য্যক্রমের গতিধারা ও বিভাগের সার্বিক অগ্রগতির পর্যালোচনা করলে। প্রশাসনিক চাকরী থেকে ডেপুটেশনে গবেষণা ইনষ্টিটিউটের পাঠানোর কারণে অনেককে দেখেছি হতাশার সাথে, বলতে গেলে প্রায় প্রায় নিলিপ্তভাবে সময় ক্ষেপণ করতে। কিন্তু ডঃ খানের মধ্যে সব সময় লক্ষ্য করেছি প্রফুল্লতা ও কর্ম-উদ্দীপনা। এটা আমার কাছে খুবই ভাল লাগতো।

ডঃ খানের মধ্যে ধীরস্থির ও দৃঢ় চিত্ততার যে সমাবেশ ছিল তা একটা ঘটনা থেকে খুবই সুষ্ঠভাবে প্রতিয়মান হয়। সময়টা ছিল ১৯৯১ ইং সালের অক্টোবর বা নভেম্বর মাস। ইনষ্টিটিউট অব ফরেষ্ট্রিতে আমি তখন পরিচালক। ইনষ্টিটিউটের পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে একদিন বিকালে ডঃ খাঁন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। কাজ শেষে পারিবারিক সুভেচ্ছা সাক্ষাৎকার বিনিময়ের জন্য সন্ধ্যার বেশ কিছু পর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থাকেন। কোন কারনে ওনার জীপ গাড়ীটা হলের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। গাড়ীটা যখন সোহারাওয়ার্দী হলের সামনে পৌছায় তখন কিছু সংখ্যক মারমুখী ছাত্ররা সরকারী গাড়ী (লাল নেম প্লেটসহ) পেয়ে প্রথমে গাড়ীটা ভাংচুর করে ও পরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গাড়ীটা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। ড্রাইভার এই চরম দুঃখজনক ঘটনার খবর ডঃ খাঁনকে জানানোর পর পরই তিনি আমার বাসায় চলে আসেন। আমার সাথে ব্যাপারটা নিয়ে সম্পূর্ণ স্থির, দৃঢ়তা ও শান্তভাবে আলোচনা করেন এবং পরবর্তীতে কিভাবে ঐ অভাবনীয় দুর্ঘটনা মোকাবেলা করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করেন এবং তার আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরবর্তীতে সরকারী দায়দায়িত্ব থেকে অব্যহতি লাভ করেন।

ডঃ খাঁনের আর একটা বড় গুণ যা আমার কাছে খুব ভাল লাগতো তা হলো তাঁর বিনীত স্বভাব। সহকর্মী, অধীনস্থ কর্মচারী, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে আলাপ-আলোচনায় তাঁকে আমি প্রায় সকল সময়ই বিনয়ের সাথে কথা বলতে দেখেছি। তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্যের ভাব আমার চোখে ধরাই পড়ে নি। ডঃ খাঁনের বড় ছেলে রানা তার সকল পরীক্ষায়ই খুবই চমৎকার সাফল্যজনক রেজাল্ট করেছে, কিন্তু তার ফলাফল জানানোর সময় সব সময়ই তাঁকে বিনীত ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে দেখেছি। সহমর্মীতাও ছিল ডঃ খানের আর এক বিশেষ গুণ। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও মহান রব্বুল-আল্-আমিন আল্লাহ ডঃ খাঁনকে জান্নাতবাসী করুন সেই কামনা করি।

জীবন ঃ প্রয়াত ডঃ খান স্মরণে

জায়েদ হোসেন ভূঁইয়া
সহ-বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম।

আবছা আবছা ভাবে মনে হওয়া ছোট বেলার
কোন একদিনের একটি অসমাপ্ত খেলা,
যে খেলার শুরু আছে-
কিন্তু শেষ হলো ঝড়ের রাতের
বিদ্যুৎ চলে যাওয়া ক্ষণের মত।
কি এক দুরন্ত খেলার নেশায়
যুগে যুগে মানুষ আসে পৃথিবীতে,
শুধু মাত্র সময়ের সংযোগ ঘটাতে,
অনাদিকাল হতে চলছে
শেষ করার জন্য জীবনের ভেলা
কিন্তু অফুরন্ত জীবনের সংযোগে
রেখে যাচ্ছে জীবনের শিকল সমীকরণ।

ডক্টর শফিক আহমদ খান

অধ্যাপক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম।

আমি তখন সিলেটে। বেশ ক' বছর অতিক্রান্ত। এই সময় ওখানে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার হিসেবে বদলী হয়ে এলেন শফিক আহমদ খান। আশ্চর্য হয়ে শুনলাম তিনি একজন ডক্টরেট উপাধিধারী। আশ্চর্য হলাম এ জন্যে যে তিনি কেন বিদ্যাবিতরণের উচ্চতম পর্যায়ে অধ্যাপনায় না থেকে বন উন্নয়ন বিভাগে। যেখানে তাঁর জন্যে গবেষণার কাজ কতখানি ছিল জানি না। তবে দেখতাম তিনি অফিসের কাজে, হিসেব নিকেশের কাজে, কাঠের তত্ত্বাবধানে, বনের উন্নয়নে সিলেটের মতো বিরাট একটি ভূখন্ডে অবিরাম বিচরণ করছেন। তাঁর কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা সত্যি আমাকে অভিভূত করেছিল। কিন্তু সবচেয়ে যেটা আমাকে বিমুগ্ধ করেছিল সেটা তিনি ও তাঁর সম্মানিতা স্ত্রীর মনোমুগ্ধকর আচরণ। তাঁদের ছেলেমেয়েরাও তেমনি সৌজন্যই রপ্ত করেছিল। মনে পড়ে তাঁর সাথে, তাঁর পরিবারের সাথে মাধবকুন্ড ও শ্রীমঙ্গল যাবার স্মৃতি। তিনটি পরিবার একসাথে একদিন, রাত এবং আরো অর্ধদিন আমাদের সবার প্রবীন বয়স কেটেছিল কৈশোরের আনন্দে। তৃতীয় জন ছিরেন বি ডি আর এর সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্ণেল বদিউর রহমান। তাঁদের ঐ সব এলাকায় ছিল জরুরী কাজ। আমিই কেবল অকাজের সহযাত্রী। সামান্য অসুস্থতার সংবাদ পেলেই তিনি সস্ত্রীক উপস্থিত হতেন নানা দ্রব্য সম্ভার নিয়ে। তাঁদের নিমন্ত্রণের মধুর স্মৃতি স্মৃতিমন্ডিত হয়ে থাকবে আমাদের পরিবারের চারজন সদস্যেরই। তাঁর এক ছেলে আমার ছাত্রও ছিল।

তারপর আমি চট্টগ্রাম ফিরে আসার পর তিনিও এলেন। আবার সেই সুখস্মৃতি। বহু প্রতীক্ষিত পদোন্নতিও তিনি পেলেন চট্টগ্রাম ডিভিশনের কনসারভেটর হলেন। কিন্তু যে কাল ব্যাধি এই হাস্যোজ্জ্বল উদাত্তপ্রাণ মানুষটিকে অজান্তে আগ্রাসন করেছিল সিলেটে, তার হাত থেকে তিনি মুক্তি পেলেন না। যদিও তাকে উপেক্ষা করে নিজের কর্মোদ্যোগকে অব্যাহত রাখতে তিনি বলতে গেলে শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন। দেখতে গিয়েছিলাম হলি ক্রিসেন্টে। তখনও তিনি ভেঙে পড়েননি। বাড়িও ফিরেছিলেন পাহাড়ের ওপরে বাংলোয়। আবার অতি দ্রুতই তাঁকে ফিরে যেতে হয় হাসপাতালে। শেষ মুহূর্তে মুমূর্ষু অবস্থায় সংবাদ পেলাম। টেলিফোন করলাম ওদের এম, ডি সাহেবকে। তিনি কোন আশার বাণী শোনালেন না। আমি ডক্টর শফিক আহমদ খানের যে আনন্দমুখর মূর্ত্তি আমার চোখের সামনে ছিল তাঁকে দেখতে যেয়ে সেই সুখ, সেই স্মৃতি হারাতে ভয় পেলাম। তাঁর সাথে তাই 'আমার আবার যখন সাক্ষাৎ হল তখন তিনি তাঁর বাংলোর সামনের লনে শায়িত। আমি দেখছি, তিনি দেখছেন না। আমি তাকিয়ে আছি, তিনি কথা বলছেন না। তারপর তাঁকে সবাই নিয়ে চলে গেলেন চট্টগ্রামের সেরা গ্রাম চুনতিতে অন্তিম শয়ানের জন্য, আমারই বাড়ির কাছ দিয়ে। আমরা একই জেলা, একই থানায় জন্মেছিলাম। যদিও সিলেটের আগে তাঁকে আমি চিনতাম না। পরে চিনলাম, জানলাম এবং হারালাম।

IN MEMORY OF A VERY GOOD FRIEND

Prahlad K. Manandhar
Agroforestry Specialist
Thana Afforestation & Nursery Development Project
Bana Bhaban, Gulshan Road, Mohakhali, Dhaka-1212

It was in July 1984 that I have had the privilege of meeting Dr. Shafique Ahmed Khan for the first time in Kandy, Sri Lanka. We were both there to attend and present technical papers in a Workshop-Seminar, sponsored by International Union of Foresty Research Organizations (IUFRO). We became friends immediately which continued till his untimely demise took him away from us. He may have disappeared from this mortal world but his memory among his many friends and admirers will remain fresh and immortal forever.

In knowing him I always felt I had become richer as he was an embodiment of good things in life. In his physical departure, I have lost a friend who is irreplaceable. From December 1984, I happened to come and work in Bangladesh in the First Community Forestry Project and I do not remember how many times we met each other since then. It was a great joy and ecstatic delight to meet him and be together.

hunati.com
Pioneer in village based website

The world will be a better abode if millions of Shafique Khans are born. Let us pray for the peace of his departed soul as well as imbibe strength to Mrs. Shafique Khan and his illustrious children.

Permanent Address:
7-562, Maru Atkonarayan
Kathmandu
Nepal.

ডঃ শফিক আহমদ খাঁন স্মরণে

ডঃ মীর মোহাম্মদ হাসান
পরিচালক
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট, চট্টগ্রাম।

জীবনে যা একবার গত হয় তা আর ফিরে আসে না জানি। তবুও মনে হয় আবার যদি সে দিনগুলি ফিরে পেতাম আবারও যদি সে দুরন্ত চপল শিশুটির মত অশান্ত চরণে নেচে বেড়াতে পারতাম। মনে পড়ে সেদিনটির কথা যেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শফিক এর সংগে প্রথম দেখা হয়। শিশির ঝড়া শীতের সকাল, রসায়ন বিল্ডিং এর সামনেটায়। সে হতে গত হয়েছে অনেকটা সময়। হায়রে শফিক সে প্রাণচঞ্চল যুবক। তুমি আজ মৃত। আজ তোমার স্মরণে লিখছি আমি মীর মোহাম্মদ হাসান। তুমি হয়তো হাসছো, তোমার সে সহজ সুন্দর হাসি। ঘড়ি দেখছো আমার সময় হতে আর কতটা বাকী। তাই না?

শফিক আহম্মদ খান আমার বন্ধু। সময়ের ব্যবধানে কখনও এ বন্ধুত্ব নিকটতর হয়েছে, কখনও বা শিথিল। তবে কখনও ছিন্ন হয়নি। পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। উভয়েই আমরা ফজলুল হক হলে থাকতাম। আমি ছিলাম পশ্চিমদিকের তিনতলায় আর শফিক থাকতো উত্তরদিকের তিনতলায়। মাষ্টার ডিগ্রীতে শফিক খানের রেজাল্ট ভাল হয়েছিল, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অসাধারণ বাগ্মিতা এবং রসঘন সংলাপ বলার দক্ষতার জন্য শফিক ছিল সুপরিচিত। খেলার মাঠ, কমনরুম এবং ছাত্র রাজনীতি তার পছন্দ ছিল না।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

শফিকের সংগে আমার কর্মজীবনে একবারই কিছুটা সংঘাতের সৃষ্টি হয়। সেটা বন বিভাগের চাকুরীতে যোগদান করা নিয়ে। এ সংঘাত ছিল একতরফা। শফিক এসব জানতোই না। আমি আশা করেছিলাম যেহেতু শফিক কমনওয়েলথ্ স্কলারশীপ এর জন্য চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত সেহেতু এ, সি, এফ প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে সে যোগদান নাও করতে পারে। আর তাহলেই আমার ভাগ্যে শিঁকা ছিড়বে। কারণ শফিকের পরেই ছিলাম আমি। শফিক পেশোয়ার চলে গেল আর আমি রয়ে গেলাম ঢাকায়।

দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতায় পরিচয় অনেকটা মুছেই যাচ্ছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা তেমনটি ছিল না। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ১৯৭৪-এ আমি বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটের চাকুরীতে আসি। শফিক সেখানে আমার সহকর্মী এবং প্রতিবেশী। পরিচয়ের নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত হতে শুরু করে আবার। কর্মজীবনে অনেকটা পোড় খাওয়া অভিজ্ঞতায় আমাদের নূতন পরিচয় হয়ে উঠে আরও গভীর এবং দৃঢ়। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা একে অপরের কাছাকাছি আসার সুযোগ পাই এবং পারিবারিক নৈকট্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আশির দশকের গোড়ার দিকে আমরা উচ্চ শিক্ষার্থে ছিট্‌কে পড়ি প্রবাসের কথিত বেদনাময় দিনগুলিতে। শফিক সারায়েভোতে আর আমি বেলজিয়ামের ঘেন্ট্-এ। স্ত্রীপুত্র ছেড়ে প্রবাস জীবনের বিরহ কাতর মন আমাদেরকে নিয়মিত পত্র যোগাযোগ রক্ষায়

উদ্বুদ্ধ করে। এসময়কার পত্রগুলি ছিল প্রবাস জীবনের বিরহ-বেদনা, আনন্দ-উচ্ছাসের অনন্য বাহক।

আগেই বলেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয় জীবন হতেই শফিক চুটকি বলায় পারংগম ছিল। একটা উল্লেখ করা যাক। ১৯৫৪ সনের বন্যায় ঢাকা শহরের অধিকাংশ এলাকা তলিয়ে যায়। আদিবাসীদের বাসস্থান এলাকা পুরান ঢাকায়ও পানি উঠে। ঢাকার আদিবাসীদের নিকট এ অভিজ্ঞতা নূতন। তাই এ নিয়ে নানা রকমের খোশ গল্প ছড়ায় ঢাকাইয়াদের মধ্যে। বন্যার পানিতে আশে পাশের গ্রাম হতে একটা কাঁইল-শিয়া (ধান বানার জন্য ব্যবহৃত এক ধরণের উপকরণ) ভেসে এসে আটকে যায় পুরান ঢাকায়। পুরান ঢাকাবাসীরা চিন্তে পারছিল না জিনিসটাকে।

তাই তারা পাড়ার সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাকে ঢাকাইয়ারা 'বুঝন মিয়া' নামে ডাকে, তার কাছে যায়। 'বুঝন মিয়া' জিনিসটাকে উল্টে পাল্টে দেখেও চিনতে পারছিল না। এমতাবস্থায় সর্দার তাকে জিজ্ঞাসা করে জিনিসটা তার কাছে অপরিচিত কিনা। এতে 'বুঝন মিয়ার' আত্মশ্লাঘায় ঘা লাগে এবং সে বলে উঠে "বুঝুম না ক্যান, বুঝুম না ক্যান, সবই বুঝি। আমি না বুঝলে আর কেউগা বুঝবে? কথাই কইছে না সর্দার যে, "এক বুঝে বুঝনমিয়া আর এক বুঝে রাব্বানী বন্যার স্রোতে ভাসাইয়া আইছে আল্লাহ মিয়ার সুরমাদানী"। আমরা সকলে হেসেই খুন। আমি নিজে ঢাকাবাসী তবুও ঢাকাইয়াদের গল্প আমাকে শফিক এর কাছে শুনতে হত। আজ শফিক সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গীয় সুন্দরতম বেহেস্তে বাস করছে।

আমি, ছায়া এবং আমাদের সকলে কায়মনোবাক্যে শফিক খাঁন এর বিদেহী আত্মার অনন্ত শান্তি কামনা করছি।

hunati.com
Pioneer in village based website

ডঃ শফিক আহমদ খানের স্মৃতিচারণ

ক্যাপ্টেন এম.জি.হোসেন, বি.এন
নৌ-বাহিনী সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা-১২১৩

মরহুম ডঃ শফিক আহাম্মদ খান সম্বন্ধে আজ দু'টি কথা লিখতে গিয়ে মনটা ব্যাথায় ভরে উঠছে। আজ ভাবতেও কষ্ট হয় যে তিনি নেই। মনে হয়, দেখা হলেই মৃদু হেসে বলে উঠবেন "গুলজার সাহেব কেমন আছেন", ভাবী বাচ্চারা সব ভাল আছেনতো? এরপর আপ্যায়ন ও খাওয়া দাওয়া ছাড়া কোনদিন আসতে পেরেছি বলে মনে হয় না।

আমার সিলেট অবস্থানকালে ডঃ শফিক ও তাঁর পরিবারের সংগে যেন অজান্তেই ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিলাম। এর কারণ বোধহয় ডঃ শফিকের বিরল ব্যক্তিত্ব। আসলে এসব মানুষের সংগে একবার আলাপ হলে আর বোধহয় দূরে থাকা যায়না। এর প্রমাণ পেয়েছিলাম ডঃ শফিকের পরিবারসহ চট্টগ্রামে বদলী উপলক্ষে বিদায় অনুষ্ঠানে। এই পরিবারটি অসংখ্য ভক্তদের ভালবাসা ও বিদায়ে ব্যথিত হবার এক অপরূপ উপলব্ধি অনুভব করেছিলাম। তিনি চট্টগ্রামে চলে আসার পর নিজেকে অনেক অসহায় মনে করেছিলাম। আসলে সিলেটে আমার একাকীত্ব জীবনে ডঃ শফিক ছিলেন একাধারে বন্ধু, পরামর্শদাতা ও অবসর বিনোদনের একজন প্রাণবন্ত সংগী।

ডঃ শফিকের আর একটি দিক যা না বললে তাঁর মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটি হল তাঁর সকল স্তরের সহকর্মীদের সংগে মধুর সম্পর্ক। কোনদিন তাঁকে কারো সংগে রেগে কথা বলতে শুনেছি বলে মনে পড়েনা। 'ফরেষ্ট্রি' তে তাঁরমত একজন অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি থাকতে পারে তা ডঃ শফিকের সংগে পরিচয় না হ'লে আমার অজানা থেকে যেত। শ্রীমংগলের সেই গভীর জংগলে ছোট একটি ডাক বাংলোর আশে পাশের গাছগুলি ছিল তাঁর পরিবারেরই সদস্যের মত। শতাধিক বছরের সেই অমূল্য গাছগুলির বিশদ বিবরণ তিনি আমাকো দিয়ে ছিলেন। একটি পুরানো গাছের দাম যে ৫০ লক্ষ টাকারও বেশী হতে পারে, তা আমার জানা ছিলনা। কেউ কোনিদন তাঁর নিকট কোন সাহায্য বা পরামর্শ চেয়ে বিফল হয়েছে এমন মনে হয় না।

ডঃ শফিক আমাদের অনেক দিয়েছেন। আমরা তাঁর প্রতিদান দিতে পারিনি। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে প্রত্যাশিত পদোন্নতি পেয়েও তিনি ভোগ করে যেতে পারলেন না। ভাল মানুষেরা বোধ হয় পৃথিবী হ'তে এমনিই চলে যায়- থেকে যায় অন্যদের স্মৃতি হ'য়ে। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা হারিয়েছি একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে, ভাবী হারিয়েছেন একজন যোগ্য স্বামীকে ও ছেলেমেয়েরা হারিয়েছে একজন স্নেহময় পিতাকে। তাঁর এই মৃত্যু বার্ষিকীতে আমি আমার নিজের ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ও তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাঁকে বেহেস্ত নসিব করেন।

'মানিক' প্রিয় ভাইটি আমার

জাহানারা ইসলাম (জুবলী)

শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে করতে আমাদের প্রিয়তম ভাইটি পৃথিবীর কাল উজ্জ্বল করা মানিকটি নিভে গেল; তার সাথে নিভিয়ে দিলো একটি সোনার মেয়ের জীবন প্রদ্বীপ। খবর পেয়েছিলাম মৃত্যুর। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছি। আর কীইবা করার ছিলো! আল্লাহ্‌র কাছে ওর জন্য জবাব দিহি করতে ইচ্ছে করে, অভিমান হয় তাঁর উপর, এমন একটি ছেলে, যার প্রয়োজন ছিল পৃথিবীর, সমাজের, ''কেন তাকে তোমার কাছে নিয়ে গেলে? কেন তুমি বোঝনা তাকে যেতে দিতে চায়না মন''- আবার পর মুহূর্তেই নিজের ধৃষ্টতার জন্য মাফ চাই। সত্যি আমাদের কিছুই করার ছিলনা। এই পৃথিবী সত্যিই একটি পান্থশালা। পথে যেতে একটা মিলনতীর্থে সবাই সবার সাথে মিলিত হয়। আবার চলে যায়-যে যে যার যার গন্তব্য পথে। মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী সবাই পথিক। এই সান্ত্বনা মনকে না দিলে মানিকের মৃত্যু সহ্য করা কঠিন। কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারছিনা। ব্যাংকক থেকে ফিরে এসেছিল ভালো হয়ে। তারপর তাকে আরও প্রাণবন্ত দেখেছি। মনেই হয়নি ও কখনো এতো অসুস্থ ছিলো। কখনো শুনিনি মৃত্যু ওর দ্বার-গোড়ায় এসে গেছে? ওকে ডাকছে। যদি জানতাম ভাইটিকে কতো আদর করতাম!

অনেক প্রিয় ভাইটি ছিলো আমার। যেসব মানুষ আমার মনজুড়ে থাকে। মানিক তাদের মধ্যে একজন। ছোটবেলা থেকে একটা প্রদীপ্ত অগ্নিপিন্ডের মতো প্রতিভা দেখিছে ওর মাঝে এবং অনুভব করেছি একটা কোমল হৃদয়ের সুকোমল অনুভূতি। বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র বলে কোন complex কখনো দেখিনি ওর মাঝে। পৃথিবীর সব মানুষের মনের ভালোবাসা নিয়ে ও বেঁচে ছিল। কিন্তু মানুষের ভালোবাসার দাবী ওর জীবনকে ফিরিয়ে দিতে পারলোনা। আল্লাহ ওকে বেশী ভালো বাসেন, তাই পৃথিবীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিলেন আপন সান্নিধ্যে। আল্লাহ্‌ ওকে স্বর্গের মনি করে রাখুন। ওর সুন্দর অকৃত্তিম ব্যবহার আমাদের সবার মনের উপর প্রভাব ফেলুক, আমরা যেন ওর মতো সবাইকে ভালবাসতে পারি এ পৃথিবীতে-এই প্রার্থনা করি।

আমার বাবাকে যেমন দেখেছি

নিয়াজ আহমদ খান (রানা)

একটি সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়েই লিখাটি শুরু করছি। পৃথিবীর প্রায় সন্তানের কাছেই তার বাবা মহামানব গোত্রীয়। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। তথাপি আজকে সন্তানের অবস্থানীয় গন্ডি ছাড়িয়ে একটু দূর থেকে আমার বাবা, মরহুম ডঃ শফিক আহমদ খানকে দেখার চেষ্টা করতে যেয়ে দেখি, এই সদাহাস্য রসিক, প্রায় অজাতশত্রু ও খোলামেলা মানুষটির অন্তরে ও বাহিরে রঙ, রস ও দর্শনের যে বিপুল রহস্য, তার সিংহভাগই আমার অজানা।

ঘরে এবং বাইরে, কর্মে ও অন্তরে, ব্যক্তি ও পেশাগত জীবনে আশ্চর্য রকম স্বচ্ছন্দ গতি ও সর্বজন প্রিয়তা তাঁর একটি দুর্লভ বৈশিষ্ট ছিল। এটি তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনা ও আন্তরিকতার ফল,- নির্ভেজাল এবং কষ্টার্জিত একটি সম্পদ। আমরা তাঁর পেশাগত মহলে এবং পরিচিত চত্বরে যখনই যাই- তাঁর সন্তান হিসেবে শত মানুষের সাহায্য ও ভালোবাসায় সিক্ত হই। ছাত্রজীবন ও পেশায় দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈব-রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং ১৯৮২ সালে প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার সারায়েভো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিসটিংশনসহ 'ডক্টর অফ সায়েন্স' ডিগ্রী অর্জন করেন। কিন্তু সবচে' বড় কথা হলো, এই বিরল মেধা ও কৃতিত্বকে তিনি পুরোপুরিই তাঁর পেশা ও মননে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশ বন বিভাগে তাঁর প্রায় দেড় যুগের সাবলীল ও সাফল্যমন্ডিত চাকরী, ৩টি গ্রন্থ ও দেশে-বিদেশে প্রচুর গবেষণামূলক রচনা এর স্বাক্ষর বহন করছে।

মানুষের ভালোবাসা অর্জনের যে ঈর্ষণীয় ক্ষমতা ডঃ খানের ছিল, তার উৎস এখনও আমার জানা নেই। মানুষের অন্তরে স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ছিল তাঁর। সামর্থ অনুযায়ী (আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে) বহু মানুষ তাঁর সাহায্য-সহানুভূতি পেয়েছে এবং তিনিও তাঁর জীবদ্দশায় ও মরনোত্তর সময়ে (সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও মতের) মানুষের নিখাদ মমতায় সিক্ত হয়েছেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে হাসপাতালের শয্যায় তাঁকে এক নজর দেখতে শ্রেণী-ধর্ম-পেশা নির্বিশেষে যে বিপুল মানুষের সমাগম হতো- তা আমাদেরকে এখনও যুগপৎ বিমুগ্ধ, বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ করে।

একটি শিশু সব সময়ে তাঁর অন্তরে বাস করতো। সম্ভবত সে'জন্যই আমরা ছোটবেলায় সবচে' বেশী বাবার বন্ধুত্ব পেয়েছি। সুকুমার রায়ের 'ডানপিটে ছেলে' থেকে কবিগুরুর 'বীরপুরুষ'- তাঁর মুখে মুখে ফিরতো। শীতের সন্ধ্যায় আলো-আঁধারির ঘুলঘুলতে তিনি যখন (আমাদের সবচে' ছোট ভাই) রুবাবকে কোলে বসিয়ে ভরা কণ্ঠে 'বীরপুরুষ' শোনাতেন- তখন তাঁর শিশুর মতো চোখদু'টোতে প্রকৃতি, বাৎসল্য ও মমতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতো। রুবাব চোখ বড় বড় করে বাবার দিকে

তাকিয়ে থাকতো আর আমরা আমাদের ফেলে আসা ছেলেবেলার সুবর্ণবন্দার ফিরে যেতাম। খেলাধুলায় তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। ভরাট গলায় গান ও কবিতা আবৃত্তি করতেন। প্রচন্ড পরিশ্রমী ছিলেন। শিকার, বনভোজন বা সফরে- অঝোর বৃষ্টি, কর্দমাক্ত পথ-ঘাট, হাঁড়-কাপানো শীত- কোন কিছুই তাঁর গতি বা আগ্রহকে বিন্দুমাত্র ম্লান করতে পারে নি কখনো। স্পষ্টতঃই বিরক্তিকর এবং শুষ্ক বিষয় থেকে কোত্থেকে যেনো বিপুল রসের উৎস খুঁজে নিয়ে মানুষকে বিমলানন্দ দিতে পারতেন। সভা-সমিতি থেকে শুরু করে দৈনন্দিন খাওয়ার টেবিলে তাঁর রস-ভান্ডারের এতোটুকু কমতি হতো না কোনদিন।

জীবন সম্পর্কে আপাতঃ হালকা মেজাজের এই মানুষটির কিছু একান্ত ও স্পষ্টতঃই গভীর জগত ছিল। ভোরবেলা তাঁর একাকী কোরআন পাঠের সময়ে, দুর্গম বন-পথে সেগুন-গর্জনের ছায়ায় তাঁর-সাথে পথ চলতে যেয়ে, ঝিঁঝি ডাকা নিঝুম চরাচরে হারিকেনের ম্লান আলোতে রেষ্টহাউসের ইজিচেয়ারে নিশ্চুপ বসে থাকা বাবার যে ধ্যানী মূর্তি দেখেছি,- বলতে দ্বিধা নেই, তার বিপুল রহস্য আমি কখনোই জানতে পারিনি।

নিজ গ্রাম ও আত্মীয় স্বজনের জন্য গভীর মমতা ছিল তাঁর। আমাদেরকেও তিনি নিজের 'শিকড়' ভুলে না যেতে শিখিয়েছেন বারবার। তাঁর খুব সাধ ছিল, শেষ জীবনে চাকরী থেকে অবসর নিয়ে গ্রামে প্রয়াতঃ মা-বাবা ও মুরুব্বীদের স্মৃতি নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সময় কাটাবেন। জীবন বরাবরই তাঁর প্রতি বড় নির্দয় ছিলো।

কারো কাছে ঋণী হতে, সাহায্য নিতে খুব কুণ্ঠা ছিল আমার বাবার। তাইতো তাঁর জীবনের সিংহভাগ আমাদের জন্য ব্যয় করলেন এবং আমরা তাঁর জন্য কিছু করার আগেই, বড় নিঃশব্দে বিদায় নিলেন। আজ আমরা তাঁর শিক্ষা ও ভালোবাসার স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, 'প্রতিষ্ঠিত' হয়েছি। বলছি- 'বাবা, এবার তোমার গ্রহণ করার পালা, এবার আমাদের কিছু করতে দাও তোমার জন্য'-- অথচ তিনি আর নেই। সব প্রতিদানের উর্ধ্বে, খুব স্বাধীনতা-প্রিয় এই মানুষটি, তাঁর প্রিয় মা-বাবার পায়ের কাছে এখন শুয়ে আছেন। আল্লাহ তাঁর সহায় হোন। আমীন।

ডঃ শফিক আহমদ খাঁন স্মরণে

মুন্সী আনোয়ারুল ইসলাম
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা,
সুন্দরবন বিভাগ, খুলনা।

প্রয়াত ডঃ শফিক আহম্মদ খাঁন কেবল মাত্র একটি নামই নয়, তিনি ছিলেন সফল ব্যক্তিত্বের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। যিনি একাধারে ব্যক্তিজীবনে, কর্মজীবনে, এমন কি সমাজ জীবনে সফলতার এক উজ্জল নক্ষত্র ছিলেন। তার অসাধারণ কর্ম দক্ষতা, তীক্ষ্ম মেধা শক্তি, অফুরন্ত প্রাণ চাঞ্চল্যতো তাকে নিঃসন্দেহে অনন্যতার আসনে আসীন করেছিল। তার অক্লান্ত শ্রম, অধ্যাবসায়, ন্যায়, নিষ্ঠা, বন বিভাগের ভাবমূর্তিকে করেছে সমুজ্জল। এই অসামান্য প্রতিভাধর, উদার প্রান ব্যক্তিটির সাথে পাশাপাশি চাকুরী ও বসবাস করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পাশাপাশি চাকুরী করতে গিয়ে তার অতি নিকটে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলাম। কাছ থেকে যতটা দেখেছি, যতটা বুঝেছি, এই স্বল্প সময়ে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এহেন সফল ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণ করা যেমন দুরুহ, কঠিন তেমনি বেদনাময়। আমি আজও সেই স্মৃতিময় দিনগুলোর গভীরভাবে স্মরণ করছি।

ডঃ শফিক আহম্মদ খাঁন এর সাথে পরিচয় হয় ১৯৭৪ সালে রাংগামাটিতে। তিনি তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম (দক্ষিণ) বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা। ডঃ খাঁনের বড় ভাই জনাব সাঈদ আহম্মদ খাঁন, ডেপুটি রেঞ্জার, তখন আমার রেঞ্জ সহকারী ছিলেন, তার নিকট জনাব খাঁনের রসবোধ, বাগ্মিতা, সরলতা ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন অথচ সবার সাথে একাত্ম হয়ে থাকার কথা শুনে জনাব ডঃ খান সাহেবকে দেখার ও তার সাথে পরিচিত হওয়ার অদম্য আগ্রহ জন্মেছিল। আমার শ্বশুর রাংগামাটিতে ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন সময়ে আমার নব পরিনীতা স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরালয়ে বেড়াতে গিয়ে ডঃ খান সাহেবের বাসায় বেড়াতে যাই। তিনি আমাদের যে সহজ, সরল, সাবলিল ও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করলেন, তা আজও আমার মানসপটে ভাস্বর হয়ে আছে। কারণ একজন শিক্ষানবীশ সহকারী বন-সংরক্ষক হয়ে দূরে থেকে একজন বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে সমঝে চলাই তখনকার স্বাভাবিক রেওয়াজ ছিল। আমার তৎকালীন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জনাব মাহাবুব উদ্দীন চৌধুরী এ ব্যাপারে যথেষ্ট গাম্ভীর্যপূর্ণ দুরুত্ব বজায় রাখতে পছন্দ করতেন। ডঃ খান খান আমাদের নব দম্পতিকে তার বাসায় খাওয়া-দাওযার পরে থাকার ব্যবস্থাও করেছিলেন। যা একজন শিক্ষানবীশ সহকারী বন সংরক্ষক এর জীবনে এক বিরাট ঘটনা বটে। বলতে দ্বিধা নেই আমার এই দীর্ঘ ২০ বৎসরের কর্মজীবনে এতটা আন্তরিকতা খুববেশী একটা পেয়েছি বলে মনে হয় না। সেই রাত্রে তার সহজ সরল অভিব্যক্তি, বিপুল বাগ্মিতা, গল্প বলার সহজ সরল ঢং, তদুপরি রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশনের ঘটনা আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান।

অত্যুক্তি হবে না যে, খাঁন সাহেবের মানবিক গুণাবলীসমূহ ছিল আমাদের অনেকের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এই প্রসংগে একটি ছোট ঘটনার কথা বলতেই হয়। ১৯৮৬

সালে ফরেষ্ট কলেজে (বর্তমানে ফরেষ্ট একাডেমী) অধ্যাপকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। ডঃ খান পূর্ব থেকেই নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি ফরেষ্ট কলেজ-প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাস নিয়ে থাকতেন। তাই অধ্যাপকের জন্য নির্দিষ্ট বাসাটিতে তিনি স্বপরিবারে থাকতেন। তৎকালিন উর্ধ্বতন যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অন্য একটি খালী বাসা আমার নামে বরাদ্দ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে, জানান যে, আমি যেন আইনের সহযোগিতায় ডঃ খান সাহেবের বাসাটি দখল নেই। বিভিন্ন কারণে আমার আর বাসা নেওয়া হয় নাই। পরবর্তীতে ডঃ খাঁন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ির এর দায়িত্বে থাকাকালীন উক্ত বাসাটি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। যদিও আর প্রয়োজন হয়নি। সেই প্রসংগে তিনি বলেছিলেন "যেটুকু পেয়েছি এটাইতো যথেষ্ট, তার চেয়ে খারাপ ও হতে পারতো"। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কত জনের মধ্যে আছে জানি না। এছাড়া তার অন্যতম গুনছিল, কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকা। সে নিজেকে নিয়ে অন্যদের বিচার করতেন। অবাস্তব ধ্যান ধারণা ও অহমিকাবোধ তার ছিল না। সর্বস্তরের মানুষের নিকট তিনি ছিলেন এক হাস্যোজ্জল, সিষ্ট ভাষী, সদালাপী, ব্যক্তিত্ব। এইগুলি ছাড়াও সামান্য আলাপ পরিচয়ের সুত্র ধরে যে কোন লোককে অতি আপন করে নিতে তিনি ছিলেন পারংগম। ইহা ছিল তার চরিত্রের এক উজ্জ্বল দিক। বিপদে হাত বাড়ালে তার নিকট থেকে সাহায্য পান নাই এমন দৃষ্টান্ত বিরল। এই মহানুভব, পরোপকারি, বিশাল ব্যক্তিত্বের সিংহ হৃদয়ের ব্যক্তিটির সান্নিধ্যে যে কোন লোক নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে করত। আমি যখন চট্টগ্রাম উপকূলীয় বন বিভাগে, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত তখন ডঃ খান এর পাঁচলাইশের বাসায় এক সাথে একান্ত আপন জনের মত কাটিয়েছি। তার সন্তান রানা, রজত, রনি ও দোলা আমার একই বয়সী সন্তানদের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেত।

বন বিভাগে ডঃ খাঁন এর ন্যায় বিপুল রসবোধ ও বাগ্মিতার সমন্বয় এবং সর্বজন গ্রাহ্য অন্য কোন ব্যক্তিত্বের আছে কিনা আমার জানা নাই। যে কোন আনুষাংগিক সভার কার্য্য আলোচনা বা বিভাগীয় দুরুহ বক্তৃতা সাবলীলভাবে শ্রোতাদের উপহার দিতে বোধ করি বন বিভাগে তার জুড়ি মেলা ভার। শিক্ষকতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা বিমোহিত করে রাখতেন। শিক্ষার্থীদের এতে এতটুকু ক্লান্তি বোধ হতো না। ফরেষ্ট একাডেমী চট্টগ্রামে তিনিই সবচেয়ে ছাত্রদের প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। আমি ডঃ খানকে তার সেই আসনে অভিবাদন জানাই। যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তার, অনুসারীদের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, কেবলমাত্র তাদেরকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, সেদিনের প্রভাবে তাহারা নিজেকেই পেয়েছে। কত অনুসারীর মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তাদের অনভিব্যক্ত দৃষ্টি শক্তি, বিচার শক্তি, বোধ শক্তি, নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হত না।

পান্ডিত্যে ডঃ শফিক আহম্মদ খান এর বিচার বিশ্লেষণ করা আমার ক্ষমতার বাহিরে। বাংলাদেশের বন বিভাগে তিনিই সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী ব্যক্তি ছিলেন। একাধারে পি, এইচ, ডি, ডি, এইচ, সি ও রাষ্ট্রপতি টিটো পদক প্রাপ্ত একমাত্র ব্যক্তি। ডঃ শফিক

আহম্মদ খাঁন, ছাত্রজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উজ্জল নক্ষত্র হিসাবে বিবেচিত। পরবর্তীতে কিছুটা খাপছাড়া হলেও পি, এইচ, ডি ও ডি, এইচ, সি লাভের পরে তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তিনি হারিয়ে যাননি। বংশানুক্রমে পরম্পরায় ও তাহারা মেধাবী হিসেবে পরিচিত। কারণ তার বড় ছেলে এস, এস, সি, এইচ, এস, সি ও অর্নাসসহ এম, এ'তে প্রথন স্থান অধিকার করে তার অসাধারণ মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। বর্তমানে সে ইংল্যান্ডের Swansea বিশ্ববিদ্যালয়ে পি, এইচ, ডি'তে অধ্যয়নরত।

তিনি যে, শুধু বাক পটু ছিলেন তা নয়, লেখাতে সমান পারদর্শী ছিলেন। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন পুস্তক ও জার্নালে নানা জটিল বিষয়ে লিখতেন। বিশেষ করে তিনি যখন উচ্চ শিক্ষার্থে যুগোশ্লোভাকিয়ায় তখনকার ১৬-১৭ পৃষ্টার সম্মোহিতকর রসবোধ সম্পন্ন পত্র, যা পড়ার ধৈয্যচ্যুতি আমাদের পরিবারের কাহারো ঘটেনি। যুগোশ্লোভিয়ার লোকের আচার ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা ও প্রয়াত প্রেসিডেন্ট টিটো সম্পর্কে থরে থরে লিখা ঘটনা বহুল কথা। তা বোধ করি কোন পর্যটকের ভ্রমন কাহিনী হিসাবে লিপিবদ্ধ করলে সঠিক মূল্যায়ন হতো। আশ্চার্য্য হতে হয় যে, বিদেশের কঠোর সাধনা ও পড়াশুনার চাপের মধ্যে তিনি এই দীর্ঘ পত্র লেখার সময় পেতেন কি করে!

আদর্শবান, প্রথিতযশা, সুপুরুষ, জীবন সায়াহ্নের অনেক আগেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তিনি গত বৎসর ১৩-১-৯২ তারিখে পরিবার পরিজন নিয়ে সুন্দরবনে বেড়াতে এসেছিলেন। তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অফ ফরেষ্ট্রীর ছাত্ররা সুন্দরবনে শিক্ষা সফরে ছিল। ডঃ শফিক আহম্মদ খান নলিয়ান রেঞ্জ সদরে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বন ভূমি তথা সুন্দরবনের লবণাম্বুজ প্রজাতির (Mongrove) গতি, প্রকৃতি ও ব্যবহার সম্পর্কে যে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা বোধ করি শুধু শ্রুতিমধুরই ছিল না তার ব্যাপক তাৎপর্যও ছিল।

আলোচনা শেষে তিনি কথা প্রসংগে সুন্দরবনের বনাঞ্চল সম্বন্ধে তথ্যগত কিছু লেখার দায়িত্ব আমাকে দিয়ে ছিলেন। তিনি বেঁচে থাকতে আমি এর এতটা গভীর উপলব্ধি করতে পারি নাই। যে দিন তার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি সে দিন তার উপদেশটা আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ঐ দিন থেকেই আমি সুন্দরবনে কর্মরত আমার সহযোগীদের নিয়ে সুন্দরবনের তথ্যগত ভিত্তির উপর একটা লেখার চেষ্টা করছি। আশাকরি ২/৩ মাসের মধ্যে ইহা আলোর মুখ দেখবে। আমার পরম আনন্দের ব্যাপার হতো যদি আমাদের এই প্রচেষ্ঠার সংকলন ডঃ খান সম্পাদনা করতে পারতেন। এটা তার জ্ঞানের আলোকে আরো অধিকতর উৎকর্ষতা লাভ করতো।

সাধারণতঃ মৃত্যুর পরে ভাই বা বন্ধুর স্মৃতিচারণ করতে গেলে তার ভাল গুণাবলী গুলোই মনে আসে। অন্য দিকটা না বলা থেকে যায়। তবুও একটা দিক না বলে পারছিনা ডঃ শফিক খান আর্থিক বিবেচনায় কিছুটা বেহিসেবী ছিলেন। বিশেষতঃ পোযাক, জুতা কেনা কাটার ব্যাপারে তার কোন হিসাব ছিল না। ভাল সিগারেট পানেরও অভ্যাস ছিল। যদিও শেষ জীবনে স্বাস্থ্যগত কারণে তা ছেড়ে দিয়ে ছিলেন।

তার অকাল মৃত্যুতে বন বিভাগ ও তার পারিবারিক জীবনে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা কোন শব্দ অলংকরনে বা ভাষা ব্যবহারে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তাই কবির ভাষায় বলতে হয়।

তোমাকে হারাতে পারি না এখনও,
হে বন্ধু, তুমি চলে যেতে পারো না।
এমনি হঠাৎ হুঁট করে তুমি,
চলে যাবে ছিলো এমন কি তাড়না।

এই ক্ষণজন্মা, মহান ব্যক্তিত্বের, আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা তাদের এক পরম হিতৈষী অভিভাবককে হারালো। তাঁর উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে অবস্থানকালে অনেক সময় তার পরিবারের সদস্যদর পাশাপাশি থেকেছি। সেই সময় নিকট প্রতিবেশী হিসেবে তার পরিবারের নৈতিক দেখাশুনার কিছুটা দায়িত্ব আমার উপর বর্তেছিল। জানিনা সেই দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পেরেছিলাম। অবশেষে তার প্রয়াত আত্মার মাগফেরাত ও পরিবারের সর্বাংগীন মংগল কামনা করে শেষ করছি।

"খোদা হাফেজ"

'মানিকদা' স্মরণে

ডাঃ এল,এ,কাদেরী

শফিক আহমদ খাঁন তাঁকে আমরা মানিকদা বলেই ডাকতাম। সত্যি তিনি ছিলেন মানিকের মত উজ্জ্বল-উচ্ছল। সদা প্রাণবন্ত এই মানুষটি আজ আমাদের মাঝে নেই ভাবলে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

বিরল মেধার অধিকারী ছিলেন মানিকদা। ছাত্রজীবনে এবং পরবর্তী কর্মজীবনে ও অধ্যয়নে তার নিদর্শন আমাদের চোখে পড়েছে।

তিনি ছিলেন Family man. নিজের ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ও আত্মীয়দের নিয়ে আনন্দ করা পছন্দ করতেন। অফুরন্ত উদ্দাম নিয়ে তিনি কাজ করে যেতেন। কখনও তাঁকে হতাশ হতে দেখিনি।

অন্যের দুঃখে সংবেদনশীল এই মানুষটি নীরবে সাহায্য করে যেতেন। তাঁকে দেখেছি দানশীল হিসেবে, অন্যকে সাহায্য করে, দান করে তৃপ্তি পেতেন। এতে কখন কার্পণ্য বা অলসতা ছিল না। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন জেনেও তিনি কখনও মনোবল হারাননি। তাতে তিনি অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব নয় জেনেও বেঁচে থাকার সংগ্রামে পিছ পা হননি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর অদম্য মনোবল, সাহস আমাদের মনে আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছিল।

এই সদা প্রফুল্ল হাস্যময় মানিকদা আজ আমাদের মাঝে নেই। এই সরল ভালমানুষটির ডাক আর শুনতে পাব না কখনও। তাঁকে আমরা ভুলিনি-ভুলা যায় না।

অনেক স্মৃতিই মনে পড়ে। তাঁর সাথে বেড়াতে গিয়েছি বান্দরবনে, সিলেটে। তাঁর আন্তরিকতায় হয়েছি মুগ্ধ, আতিথেয়তায় হয়েছি আপ্লুত।

তাঁর কথা মনে হলে গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়ে কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু। তা মুছে ফেলে আবার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এই তো জীবন!

তাঁর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারি? পরম করুণাময় তাঁকে বেহেস্‌তে নসিব করুন---এই কামনা করি।

তোমারে হারায়ে খুঁজি

দীন মুহাম্মদ মানিক
অধ্যক্ষ, চুনতী মহিলা কলেজ
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

মানিকদার স্মৃতিচারণ করে কাউকে তৃপ্ত করা সম্ভব নয়। তার বাল্যজীবন, ছাত্রজীবন, বলতে গেলে সারাটাজীবনই গ্রামের বাইরে কাটিয়েছেন তিনি।

কতটুকুই বা জানবো তাঁর সম্পর্কে। তাই তাঁর কর্মবহুল জীবনের আদ্যোপান্ত জানাবার দায়িত্ব সংকলনের অন্যান্য অংশীদারগণের উপর দিয়ে আমি শুধু টপ্‌কা স্মৃতিচারণ করবো তাঁর।

পাকিস্তান আমলের এক নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার (বর্তমান লোহাগাড়া) অন্তর্গত চুনতি ছিলো শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। এই গ্রামের এক অতি উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে ডঃ শফিক খান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম কবির উদ্দিন আহমদ খান ছিলেন তৎকালিন বৃটিশ ও পাকিস্তান সরকারের অধীনে একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট)। ডঃ খানের পূর্বপুরুষ জনাব মরহুম ডেপুটী নাসির উদ্দিন খান থেকে আরম্ভ করে তাঁর বাবা, চাচা, ভাই এমনকি বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত প্রায় সবাই- সু-শিক্ষিত এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে সমধিক পরিচিত। খোদাভীরু এবং কর্তব্যপরায়ন ব্যক্তি হিসেবে কর্মজীবনের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বংশের প্রায় সবাই প্রতিষ্ঠিত। মনে হয়, আগামী দিনেও তাঁদের এ পারিবারিক ঐতিহ্যের চাহিদা এদেশে বহাল থাকবে। যাক্, আমি আর সেদিকে যাচ্ছিনে, সত্যকে তুলে ধরতে গিয়ে অনেকেই এ সম্পর্কে নানাকিছু মন্তব্য করতে পারেন। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন নীরব কর্মীকে জীবনেত কিছুই দিতে পারলামনা অন্ততঃ তাঁর কর্মস্থল জীবনের মরনোত্তর পরিচিতিটা তুলে ধরে হলেও দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করা যায় কিনা তারই যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

ছাত্র হিসেবে ছিলেন দারুন মেধাবী। ব্যবহারে ছিলেন অমায়িক, বন্ধুবৎসল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এস, সি'তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান দখল করে তিনি সেই অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। আত্মগৌরব জিনিষটা তাঁর মাঝে কোনদিন দেখিনি। ছোটবড়, ধনীগরীব সকলের সাথে মিশতে তাঁর কার্পণ্য ছিলো না। গ্রামের বাড়ীতে এলে তাঁর আগমন সকলের মনে আনন্দের সঞ্চার করতো। বিশেষ করে একজন শিল্পী হিসেবে তিনি ছিলেন অতূলনীয়। তাঁর আসার সাথে সাথে আমরা নাটক, বিচিত্রানুষ্ঠান ইত্যাদিতে মেতে উঠতাম। তাঁর কণ্ঠ ছিলো অপূর্ব। অবচেতন মনে হঠাৎ মনে হতো যেন স্বয়ং হেমন্ত গাইছেন। আমাদের ছাত্রজীবনের সময়টা ছিলো নায়ক উত্তম কুমারের যুগ। 'উত্তম-পাগল' আমরা তাঁকে দেখে উত্তমের সাধ মেঠাতাম। তিনি ছিলেন আমাদের অনেক 'সিনিয়র'। তাই তাঁকে সাক্ষাতে জানাতে ভয় হতো সেই সাদৃশ্যের কথা। মানিক দা আজ আমাদের মাঝে নিই। কিন্তু নির্দ্বিধায় বলতে পারি,

তিনি যে জীবনে বড় কিছু হবেন, তাতে কোন সন্দেহ ছিলনা। নায়ক হিসেবে, গায়ক হিসেবে এবং সর্বোপরি নেতা হিসেবে তিনি একজন বিখ্যাত লোক। এমনি একজন ব্যক্তিত্বকে অকালে হারায়ে আমরা শুধু নই, সারা দেশটা যে কতবড় ক্ষতির সম্মুখীন হলো,- তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবুও নিয়তিকে মেনে নিতে হয়। প্রত্যেকের জন্যে মৃত্যু অবধারিত। স্রষ্টার হুকুমের বাইরে কারো হাত নেই.... । কর্মজীবনে এসে সাধারণতঃ তেমন কেউ আরো উচ্চতর ডিগ্রী নিতে চায় না। কিন্তু মানিকদা ছিলেন একজন আজীবন ছাত্র। তাইতো চাকুরী জীবনে এসেও তিনি থেমে যান নি। সর্বোচ্চ ডিগ্রী তাঁকে নিতে হবেই... । সেভাবে এগিয়ে গেলেন তিনি এবং কর্মবহুল জীবনের এক ফাঁকে নিয়ে নিলেন ডক্টরেট ডিগ্রী যা বলতে গেলে যে কোন মানুষের রঙিন-জীবন-স্বপ্নে এক দূর্লভ সোনার হরিণ--- ।

বলতে গেলে সম্পূর্ণ আপন গতিতে, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবনের শেষ দিকে তিনি বন-সংরক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। চাকুরী যা-ই হোক, -- তাঁর আসল ঝোঁক ছিলো পড়া এবং পাঠদান করা। তাই তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরেষ্ট্রী বিষয়ের উপর খন্ডকালীন অধ্যাপনার দায়িত্ব। বলতে গেলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরেষ্ট্রী বিভাগ খোলার পেছনে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। অধ্যাপনাকে তিনি এতোই ভালোবাসতেন যে, তাঁর বড় ছেলে নিয়াজ খান (রানা) মোটা বেতনে ভালো চাকুরী পাওয়া সত্ত্বেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এবং সে কারণেই নিয়াজ এখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক-প্রশাসন বিভাগে অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন-সংরক্ষকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবার বেশ কিছু আগেই উনার ঘনিষ্ট সংস্রবে আসার সুযোগ হয় আমার চুনতি মহিলা কলেজকে কেন্দ্র করে। এলাকার ও বাইরের আপামর জনসাধারণের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত এ কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পর্বতপ্রমাণ সমস্যা-জর্জরিত হয়ে আমি যখন হতাশ হয়ে পড়তাম, তখন শেষ ভরসার গন্তব্য হিসেবে যাঁদের কাছে ছুটে যেতাম, মানিকদা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। (তাঁর নিজের উদ্যোগে দূর দূরান্তের বিভিন্ন গুনীজনের সহযোগিতা আমরা (চুনতি মহিলা কলেজ) পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে বরাবরই উৎসাহ প্রদান করতেন এবং কর্মব্যস্ততার কারণে স্বয়ং আত্মনিবেদিত হয়ে মহিলা কলেজের মতো মহতী একটা উদ্যোগকে যথাসাধ্য অগ্রগতি দিতে পারছেন না বিধায় আক্ষেপ করতেন। আমার আজো মনে পড়ে, কলেজের সমস্যা তুলে ধরে সমষ্টিগতভাবে সমাধানের পদক্ষেপ হিসেবে তিনি তাঁর অফিসের সম্মেলন কক্ষে এলাকাবাসী ও শিক্ষানুরাগী গুণীজনদের নিয়ে একটি মহাসম্মেলন ডাকার আশা ব্যক্ত করেছিলেন। আগত অতিথিবৃন্দের আপ্যায়নসহ যাবতীয় ব্যয়ভার কলেজের স্বার্থে নিজে বহন করার ইচ্ছে ছিলো তাঁর। সম্মেলনের কাজ কিছুটা এগিয়েও গিয়েছিলো। কিন্তু বিধাতার অমোঘ বিধান, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং এটাই ছিলো তাঁর শেষ অসুখ। এক মৃত্যুহীন প্রাণ দান করে তিনি চির বিদায় নিলেন)- ।

দেশকে নিয়ে, কলেজকে নিয়ে তিনি যে কত রঙিন স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর সান্নিধ্যে এলে আলাপের মাঝে তার পরিচয় পাওয়া যেতো। মনে হতো যে, এক স্বপ্নের রাজপুত্তুর রূপকথার রাজ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করছেন......। তাঁর দর্শন মতে, এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে যেমন ব্যাপক বনায়নের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সত্যিকার মুক্তি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ব্যাপক নারী শিক্ষার। পুরুষের পাশাপাশি নারী শিক্ষায় তুলনামূলক অগ্রগতি না হলে দেশ ও জাতির সত্যিকার প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব নয়, ভালো জাতির জন্যে চাই ভালো মা। আজ মনে হয়, সম্ভবতঃ তাই তিনি নিজগ্রামের এ মহিলা কলেজটির প্রতি ছিলেন এতো দূর্বল।

মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করতাম "কেমন আছেন"। বলতেন "সম্পূণই ভালো। এখন কোন সমস্যাই নেই আমার।" তিনি আমাকে বলতেন, "মানিক! অতি সত্বর আমার প্রমোশন হবে। তদবীর নেই বলেই এতোদিন দেরী হয়েছে। যাক্, তুমি হাল ছেড়ে দিও না, তোমার কোন সমস্যা থাকতে দেবো না ইনশাল্লাহ.....। মানিকদা বন সংরক্ষক হলেন ঠিকই, কিন্তু ঐ চেয়ারে বেশীদিন বসা তাঁর আর সম্ভব হলো না। ডাক আসলো আসল মালিকের। পার্থিব সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত করে। মনের সব কথা জীবন সায়াহ্নে উজাড় করে বলে, হাসিমুখ নিশ্চিত মৃত্যুকে স্বাগতম জানিয়ে চির বিদায় নিলেন (১৯৯২ সনের ৫ই জুন তারিখে) অনন্ত জগতের উদ্দেশ্যে.....।

তার অকাল মৃত্যু আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিলো সমধিক। মনে হয় এখনো মানিকদা জীবিত আছে।

কর্মজীবনের সংশ্লিষ্ট বিভাগে নীচ থেকে উপর তলার মহলে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তাঁর অবস্থান ছিল। উল্লেখ্য যে, বনবিভাগ 'অরণ্য' নামে তাদের নিজস্ব সংকলনটির প্রথম প্রকাশনা সংখ্যা মরহুম ডঃ শফিক খানের নামেই উৎসর্গিত করেছে।

আমাদের চুনতি গ্রামটাকে বাইরের প্রায় সবাই একটু শ্রদ্ধার দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করে। এবং যে কারণে বিবেচনা করে, মনে হয়, মানীকদা'দের মতো ক্ষণজন্মা কিছু কৃতি সন্তান চুনতির ঘরে জন্ম নিয়েছিলো বলেই--। আধ্যাত্মিক জগতের কিছু মহাপুরুষও পরম করুণাময় চুনতিকে দান করেছেন,--- এ জন্যে তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রজন্মের চালচলন, আচার ব্যবহার, জীবনের অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছার অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টা অন্যান্য পার্শ্ববর্তী এলাকার বংশধরগণের অগ্রগতির তুলনায় আমাদের বড়ই হতাশ করছে। এখনো সময় আছে, আত্ম সমালোচনার মাধ্যমে আমাদের সংশোধন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আমি আশা করবো, মানিকদা'র মতো যারা জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়ে এতদৃঞ্চলের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিৎ। পতনোন্মুখ আবছা অন্ধকারে আমরা শুধু মানুষরূপী লোকারণ্য দেখবো--মানুষের সন্ধান পাবো না।

একজন ভাল মানুষের স্মৃতি কথা

আলী আকবর কোরেশী
মহকুমা বন কর্মকর্তা
ট্রেনিং-স্পেশ্যালিষ্টের কাউন্টার
বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা।

আমার সুদীর্ঘ চাকুরী জীবনে যে সকল বন কর্মকর্তার সান্নিধ্যে এসেছি তার মাঝে মরহুম ডঃ শফিক আহমদ খাঁনকে দেখেছি অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও গুণের অধিকারী। সরাসরি তাঁর অধীনে চাকুরী না করলেও পাশাপাশি ও বিভিন্ন কাজে একত্র কাজ করে তাঁর সম্বন্ধে আমি এইটুকুই মন্তব্য করব- যে জনাব ডঃ শফিক আহমদ খাঁন একজন অতি ভাল মানুষ ছিলেন। ভাল মানুষের জন্য খুব বেশী কিছু বলতে হয় না।

সামান্য দু'টি কথা বলে তাঁর মানবিক গুণাবলীর নমুনা দেওয়া হলঃ আমি তাঁর বাসার পাশেই সরকারী বাসায় থাকি তবুও কাজের চাপে বেশ কয়েকদিন দেখা হয় নাই- তাই তিনি একদিন সকালে হাফ প্যান্ট পরে প্রাতঃভ্রমণ করে আমার বাসায় হাজির। আমিও বাসার সামনে লনে জগিং করছিলাম। হেসে বল্‌লেন কোরেশী সাহেব ব্যাপার কি? আপনি আমার নিকটতম প্রতিবেশী অনেকদিন আপনাকে দেখি না? এটাতো মোটেই ভাল নয়!

Ghunati.com
Pioneer in village based website

আমি বিনয় সহকারে বল্‌লাম স্যার খুব কাজে ব্যস্ত তাই আপনার সাথে কয়েকদিন দেখা করতে পারি নাই। তিনি বল্‌লেন- না না কোন অজুহাতেই মাপ করা যায় না। আমার বাসার সামনে দিয়েই আপনার যাতায়াতের পথ। আপনার অবশ্যই একবার বলা উচিত ছিল হ্যালো স্যার কেমন আছেন?

আর একদিন কি যেন একটা বন প্রযুক্তি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আহরণের জন্য ডঃ শফিক আহমদ খাঁনের কাছে যাই যিনি ঐ বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ বলে সবার কাছে পরিচিত। তাই আমি যেয়ে বল্‌লাম স্যার আমি অজ্ঞ মানুষ আমার কাছে এই গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমিতো তেমন কিছু জানি না তাই আপনার কাছে এসেছি, কিছু জানতে। আপনি স্যার বিশেষজ্ঞ মানুষ!

তিনি হেসে অতি সুন্দর রহস্য করে বললেন- কোরেশী সাহেব আপনি অজ্ঞ মানুষ- আপনি তাও কিছু জানেন। আমি বিশেষজ্ঞ মানে বিশেষভাবে অজ্ঞ। কিছুই জানি না।

এমনি অনেক হাজার কথা তাঁর কাছে শোনা যেত। তাঁর কথা শুনে খুশী না হয়ে উপায় ছিল না। তাঁর এই মৃত্যু বার্ষিকীতে আমি আমার নিজের ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ও তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাঁকে বেহেস্ত নসিব করেন।

শফিককে স্মরণ করি

লুৎফর রহমান
রুমঘাটা, চট্টগ্রাম।

জগতে এমন কিছু মানুষ আছে খোলা চোখে তাদের দেখা যায় মাত্র, চেনা যায় না। চেনার উপায় আছে হৃদয় দিয়ে। চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়। হৃদয় তা' ধরে ফেলে। জীবাণু আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীর যেমন মাইক্রোসকোপ, তেমনি আমাদের মাইক্রোসকোপ হলো জিজ্ঞাসু হৃদয়। চোখটা দেখার মাধ্যম, হৃদয় অনুভবের।

শফিক আহমদকে চিরদিন চোখ দিয়ে দেখেছি। সেখানে সে একজন সরকারী কর্মকর্তা। যার প্রাত্যহিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিলো বিল, চেক, নানা রকম টাইপ করা কাগজ সই করা যা কলিং বেল টিপলেই একজন কেরানী বা পিয়ন সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসে। কিম্বা "বসের" ডাকে সাড়া দিয়ে "অতি প্রয়োজনীয়" মিটিং এ বসা, যা না হ'লে যে কোন মূহূর্তে দেশের সেই বিভাগের 'সর্বনাশ' হয়ে যাবে কিম্বা "হয়ে যেতে পারতো"। এই ধরনের এক দিনান্তে বাসায় ফিরতেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি ব্যাপার ? খুব শ্রান্ত নাকি ? জবাবে বলল "আর বলবেন না-গাড়ীর পেট্রোল পোড়াটাই সার"। ওর প্রতি বিভাগীয় সুবিবেচনা-অবিবেচনার বিবরণ আমার জানা নেই। মাঝে মাঝে মুষড়ে পড়তো কিন্তু কখনও ভাঙতে দেখিনি। স্বল্পদৈর্ঘ্য ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ঝড়ঝন্ঝা, ওলট-পালট ওকে সহ্য করতে হয়েছিলো, কিন্তু মুখের উপর রসাত্মক মুচ্কি হাসিটি লেগে থাকতো। হৃদয়ের গভীরে এই রসের ভান্ডার লুকানো না থাকলে হয়তো তার পরিচিতিটাই একঘেঁয়ে গতানুগতিকতা ছাড়া আর কিছুই হতোনা। কিন্তু ওকে পেয়েছি আমরা গতানুগতিকতার বাইরে। জগতে সম্পূর্ণ নির্দোষ কোন ব্যক্তি আছে কিনা আমার জানা নেই। দোষগুণ মেশানো স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে থেকেই আমাদের পরখ করে নিতে হবে কার জন্য কত স্বার্থক। ব্যক্তির মধ্যে "বহুর" মঙ্গল কামনার পরিমাণ হবে ওকে বিচারের মাপকাঠি। শফিকের মধ্যে ছিলো এই মানসিকতার প্রবণতা, যা তাকে অনেকের মধ্যে বিশেষ করে তুলেছিলো। সমগ্র পরিবারের প্রতি তার বিদ্বেষহীন দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অনুকরণীয়। প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে দূর্মুখকেও অতি সহজে ক্ষমা করার অসীম ক্ষমতাই তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পাইয়ে দিত অতি সহজেই। একটী কম্পিউটার যেমন মস্তিষ্কের বিকল্প, ওর বেলায় ঠিক তার উল্টো। ওর মস্তিষ্কটাই ছিলো অনেক কম্পিউটারের সমন্বিত একটা বাক্স যেন। ছেলেবেলার আম চুরি থেকে যৌবন বা প্রৌড়ত্বের যে সব ব্যবহারযোগ্য ঘটনাবলি সব ওই বাক্সে স্ব স্ব মূর্তিতে ধরে রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো ওর। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যথাস্থানে এমনভাবে উপস্থাপন করতো যা শ্রোতার মস্তিষ্কে অনেকদিন স্মরণে থাকার ব্যবস্থা করে নিতো। শালীনতা ও পরিমিতি বোধের কারণে শ্রোতার জন্য অনেকদিন তা সম্পদ হয়ে থাকত।

Shunati.com

এটাকে তার 'মেরিট' বলা চলে, যার বলে সে শুধু সামাজিক বা প্রফেশনাল সফলতা যে অর্জন করেছিলো তা' নয়- শিক্ষা ক্ষেত্রে সে তার মেধার প্রখর চিহ্ন রেখে

গেছে। স্বদেশে শিক্ষা জীবনে সে সব সময় প্রথম সারিতে ছিল। এতে আমরা গৌরব অনুভব করেছি কিন্তু বিস্মিত হয়েছি যখন বিদেশে গিয়ে বিদেশী ভাষায় সবাইকে টপকে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী আদায় করে ছিনিয়ে এনেছে স্বর্ণপদক। দুঃখের বিষয় তার এই অসাধারণ মেধাকে আমাদের সরকার কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন। আসলে আমাদের দেশে বর্তমান পরিবেশে মেধার মূল্যায়ন অবহেলিত পর্যায়ে রয়েছে। বলা যায় কর্মক্ষেত্রে মেধার জন্য ওকে পুরষ্কৃত করার পরিবর্তে পরোক্ষে নির্যাতীত হতে হয়েছে। ওর বিভাগে অন্যান্যদের জন্য এটিকে সতর্কবাণী মনে করলে বেশী বলা হয়েছে মনে করার কোন কারণ নেই।

সব মানুষের চরিত্রের নানা দিক থাকে। আমার চেয়েও যারা শফিকের সাথে বেশী ঘনিষ্ঠ ছিলো সেসব মূল্যায়নের দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তায়। আমার সাথে তার যে সম্পৃক্ততা- আমি শুধু সেদিকটারই আংশিক উল্লেখ করেছি মাত্র। এই আলোচনায় আমার বারবার মনে হচ্ছে ওর প্রতি আমরাও অবিচার করেছি। আমরা কি ওর যথার্থ পাওনা ওকে দিয়েছি? আজ সে ধরাছোঁয়ার বাইরে। তার গুণগানে পঞ্চমুখর হয়ে প্রমাণ করতে চাই যেন জীবিতকালে "আমিই" তার ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি ছিলাম। এটা জীবনী লেখদের গতানুগতিক প্রবণতা। নিজ স্বার্থেই ওরা তা করে থাকে-সেটা হোক যশ, স্নেহ বা বিত্ত যে কোন কারণে। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। তবে সেটা ব্যতিক্রমই।

শফিক খানের শিক্ষা জীবন রয়েছে। রয়েছে চাকুরী জীবনের ইতিবৃত্ত বা উত্থান-পতন, সংকট, সুখ-দুঃখ নিয়ে পারিবারিক জীবন। সেটা আলোচনা করার অগ্রাধিকার তার পরিবারের সদস্যবৃন্দের, যাদের জানা রয়েছে তার পুর্ণ তথ্য ও ধারণা।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

সে চলে গেছে চিরতরে। একটী অতৃপ্ত কামনা, অব্যক্ত একটি বেদনা হয়তো তার ছিলো যা তার জীবন নাটকের শেষ পর্যায়ে-সম্ববতঃ মৃত্যুর দিন তিনেক আগে আমাকে বলা কয়েকটি লুক্কায়িত চরণ উচ্চারণ থেকে আমার উপলব্ধিতে ধরা পড়েছিলো। আমি তা' এখানে উল্লেখ করছি শেষ করার আগে।

"আমার না বলা বাণী
ঘন যামিনীর মাঝে-----"
"কোন এক অন্ধকারে আমি যে
হারিয়ে যাচ্ছি ------"

কিন্তু আমরা কি ওকে হারিয়ে যেতে দেবো?

মেধা ও সততার বিশুদ্ধ সমন্বয় ঃ 'মানিক মিয়া'

হেলাল হুমায়ুন

কারো কাছে ঋণী হতে তিনি ছিলেন কুণ্ঠিত, অথচ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে মানুষের হৃদয় গন্তব্যকে পুরোপুরি আবিস্কার করে নিতে যার জুড়ি ছিলনা। মেধা ও যোগ্যতার সমন্বয়ে যিনি নিজেকে একজন যোগ্য মানুষ হিসেবে তৈরী করতে পেরেছিলেন সামান্য আলাপ পরিচয়ের সূত্র ধরে যিনি যে কোন লোককে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে দিতে পারতেন সহজে, অত্যন্ত কঠিনকে খুব সহজ এবং মিষ্ঠ ভাষায় বোঝাতে পারতেন বলে যিনি ছিলেন ছাত্রদের সবচে প্রিয় শিক্ষক। সদা হাস্যোজ্জল মুখাবয়ব, শুধু হাসতেন- দুঃখ যাকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি, বলতেন না শুধু, বলা থেকে রঙরস ও দর্শনের বিপুল রহস্যও খুঁজে পাওয়া যেত। মানুষকে ভালবাসতে জানার ঈর্ষণীয় ক্ষমতাবলে যিনি ছিলেন অজাতশত্রু-তিনিই ডঃ শফিক আহমদ।

ডাকনাম মানিক, বাবা মৌলবী কবির উদ্দীন খান ডাকতেন 'মানিক মিয়া' বলে। মা-বাবার আদুরে মানিক- যেমন সুঠাম দেহী তেমনি ছিলেন মানিকের মতো সুদর্শন। মেধায়-আচরণে-স্বভাব-চরিত্রে তাকে মানিক নামকরণের স্বার্থকতা ছিল যথার্থই। জন্ম গ্রহণ করেছেন মানিকগঞ্জেই। যেখানে বাবা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেব কর্তব্যরত ছিলেন।

মানিক মিয়া ছিলেন তেজস্বী মেধার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ১৯৬০ সালে কৃতিত্বের প্রথম সোপানে পা রাখলেন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈব রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। এরপর হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন ডিসটিংশনসহ 'ডক্টর অব সায়েন্স' ডিগ্রী-যুগোশ্লাভিয়ার সারায়েভো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এ সময় যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট টিটো তাকে স্বর্ণ পদকে অলংকৃত করেন। তিনি গবেষণার জগতে কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনটি বইসহ অসংখ্য গবেষণামূলক রচনা লিখে। কঠিন অথচ সরল ভাষায় তার এ লেখাগুলো দেশী-বিদেশী পাঠকদের সহজে বোধগম্য হয়।

কর্মের প্রতি স্বাচ্ছন্দ তীব্রগতি তার মেধার সাক্ষ্য দেয়। গবেষণার সাথে সাথে ১৯৬৩ সনে তার কর্মজীবন শুরু হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রাঙ্গামাটি বনাঞ্চলের অতন্দ্র প্রহরী 'মানিক মিয়া' কর্মদক্ষতা দিয়ে জীবনকে থরে থরে সাজিয়ে নেন। এক সময় তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের "কনজার্ভেটর অব ফরেষ্ট" হন। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের বন বিভাগে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী ব্যক্তি।

কেউ বাকপটু অথচ লেখতে পারেন না। আবার কেউ ভাল লেখতে পারেন-বলতে পারেন না। 'মানিক মিয়া' ছিলেন এর ব্যতিক্রম। দু'এ সমান পারদর্শিতা তাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। কথায় তাকে হারাতে পেরেছে কেউ-এমন দৃষ্টান্ত অত্যন্ত কম (ফরেষ্ট একাডেমী চট্টগ্রামের ছাত্ররা মানিক স্যারের ক্লাসের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করত। সাবলীল রসমাখা তার ঘন্টা দেড়েক লেকচারে ছাত্রদের ক্লান্তি আসার কথা ভাবা যায়না।)

ইংরেজী, বাংলা, সার্বো-ক্রোশিয়ান, আরবী, উর্দু-পাঁচ ভাষায় সুপন্ডিত 'মানিক মিয়া' কর্তব্যের অবসরে রবীন্দ্র সংগীত গাইতেন। যে কোন আড্ডায় তিনিই হতেন মধ্যমনি।

অহমিকা, মিথ্যা, লালসা থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। তাইতো কেউ শত্রুদের তালিকায় তার নাম বসাতে পারেনি। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এটাই--হাতে গোনা দেশের প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের মাঝে তিনিই, যাকে ক্ষমতার মোহ একটি মুহূর্তের জন্যও আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

ইসলামী অনুশাসন মেনে চলায় 'মানিক মিয়া' ছিলেন সচেতন। তিনি নামাজ পড়তেন, তাহাজ্জুদের পর ফজর সেরে তিনি কোরান তেলাওয়াতে এভাবেই নিমগ্ন হতেন যেন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোন এক রহস্য পুরীর সাথে তার ক্ষুরধার মেধার বিশুদ্ধ সমন্বয় ঘটে যেত।

চট্টগ্রামস্থ সাতকানিয়া লোহাগাড়ার ঐতিহ্যবাহী চুনতী গ্রামের ডেপুটি বাড়ির এই মানিকটি সিলেটে কর্তব্য পালনরত অবস্থায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। ক্রমে বদলী হন চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে আর বেশী দিন দায়িত্ব পালন করা হয়নি। হলিক্রিসেন্ট হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে মাথা রেখে চির নিদ্রায় ঢলে পড়েন।

বলতে হয়, 'মানিক মিয়া' ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ। মনুষ্যত্বের শেষ পরাকাষ্ঠাকে তিনি অতিক্রম করেছিলেন। আদর্শের হুবহু সংস্করণ, 'মানিক মিয়ার' জীবন চলার পথ ছিল অনুকরণীয়। তিনি নেই; অথচ তার আদর্শ অনুস্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

Ghurati.com
Pioneer in village based website

'মানিকদা' যেমন ছিলেন

আমিন আহমদ খান
ডেপুটি বাড়ী, চুনতী

সাত ভাইদের মধ্যে তিনি ছিলেন ৪র্থ। মানিকগঞ্জে জন্মেছিলেন এবং "মানিকের" মত সুন্দর ছিলেন বলেই মা-বাবা আদর করে তাঁকে মানিক ডাকতেন, ছোট ভাই বোনদের কাছে তিনি ছিলেন আদরের মানিকদা যদিও তার পুরা নামটি ছিল শফিক আহমদ খান।

মানুষ মারা যাবার পর সবাই এক বাক্যে বলেন লোকটি ভাল ছিলেন। কিন্তু মানিকদা শুধু ভাল ছিলেন বললে তাঁর মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিচার হয় না। তিনি শুধু ভালই ছিলেন না তিনি ছিলেন ছোট বড় সকলের ভাই, সকলের বন্ধু। তাই তিনি মারা যাবার পর মুহূর্তে অধ্যক্ষ মানিক সাহেব নিজের মন থেকেই আমাকে বলে ছিলেন, তুমি কাঁদছো কেন? ভাইতো তুমি একা হারাওনি, আমিওতো হারিয়েছি।"

ছোটকাল থেকেই তিনি ছিলেন আত্মসংযম ও জীবন সংগ্রামের প্রতীক। বাবা চাকুরীতে অবসর গ্রহণ করার সময় ১৯৫২-এ তিনি ময়মনসিংহ সিটি কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। বাবা নিজ গ্রামে চলে আসেন, তাঁকে রেখে আসেন বাবার বন্ধু গোলাম রব্বানী ভূঁইয়ার বাড়ীতে, শুরু হয় জীবন সংগ্রাম। অত্যন্ত সততা ও বিশ্বস্ততার সংগে চাকুরী জীবন শেষ করে বাবার হাতে কোন সম্পদ বা টাকা-কড়ি না থাকায় ছেলের লেখা পড়ার খরচ চালানো বাবার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। মানিকদা'র তাতে কোন দুঃখ ছিল না। তিনি অভাব অনটনের মধ্যে থেকেই ১ম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আত্মীয়ের বাসায় থেকে কুমিল্লা ও ঢাকায় ছাত্র পড়িয়ে নিজকে নিজে চালিয়ে নেন। ঢাকায় চাচী শ্রদ্ধেয়া বেগম সুফিয়া কামালকে তিনি 'মা' বলে ডাকতেন এবং চাচীও মানিক বলতেছিলেন অজ্ঞান। জনাব সেকান্দর আবু জাফর ছিলেন মানিকদা'র প্রিয় ব্যক্তিত্ব। শামীম ভাই, লুলু, টুলু, বুড়ন, আপা, জামিল ভাই সবারই একান্ত প্রিয় ছিলেন মানিকদা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ কামালের তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র। মানিকদা ছিলেন ডঃ কামালের বায়ো-কেমিষ্ট্রি বিভাগের ১ম ব্যাচের ছাত্র ও এই বিভাগে তিনি ১ম বিভাগে ১ম হয়ে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় আলোচিত ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। কঠিন অর্থ-কষ্টে থেকে ও তার মুখে কখনও দুঃখ দেখা যায়নি, বরঞ্চ বাবাকে তিনি শান্ত্বনা দিতেন। বাবার চরম অর্থ সংকটে যৎ-সামান্য সাহায্য করতেন ও ভাই বোনদের জন্য বাড়ী আসার সময় এটা ওটা হাতে করে নিয়ে আসতেন। মানিকদা আসছেন শুনলে বাড়ীতে ঈদ উৎসবের পরিবেশ বনে যেত। মা-বাবা বলতেন 'আমার মানিক আসছে'। বাড়ী আসার পর বাবা তাঁকে নিয়ে বসতেন, অনেক গুরুতর সমস্যা আলোচনা করতেন, এত অল্প বয়সেও গাম্ভীর্য্যের ভাব নিয়ে বাবার সঙ্গে নানা সমস্যার সমাধান এর পথ খুঁজতেন। ঢাকা ফিরে

যাওয়ার দিন আমরা সবাই তাঁকে বিদায় দিতাম, সবাইকে আদর করে আব্বা আম্মাকে সালাম করে তিনি বিদায় নিতেন, আমরা কয়েকদিনের জন্য শোকাহত হতাম।

বাবার ইচ্ছা ছিল তিনি পি এইচ ডি করুন অথবা সুপিরিয়র সার্ভিসেস্ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করুন। বাবাকে আর্থিক সহায়তা করার জন্য পি.সি.এস. আই. আর. এ গবেষণা সহকারীর চাকুরী গ্রহণ করেন, এই সময় তিনি শ্রদ্ধেয় ডঃ কুদরত-ই খোদার নিকট অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সিনিয়র ফরেষ্ট সার্ভিসে যোগদান করে আমৃত্য বন্ধু মহলে খ্যাতি নিয়ে চাকুরী করেন। তার প্রত্যেক পদোন্নতিতে তিনি মা-বাবা ভাই বোন ও গ্রামবাসীদের কাছে ছুটে আসতেন। আনন্দের সংবাদ দিতেন, দোয়া করতে বলতেন ও মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতেন। তাঁর কাছে বড় ছোট ভেদাভেদ ছিল না, সবার সমস্যা মনযোগ দিয়ে শুনতেন। যদ্দুর সম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করতেন। কোন দিন তার মুখে কটুবাক্য শুনা যায়নি বা মেজাজ করে কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়নি। অনেক দুরের মানুষও তার কাছে আপন হয়ে যেত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নিয়ে যারা তার কাছে যেতেন তাঁরা তার আদর আপ্যায়নে, ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ফিরে আসতেন, সাহায্য না পেলেও তাদের কোন আফসোস থাকতো না। গ্রামে আস্লে আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী তাকে নিয়ে বিভিন্ন আসর, অনুষ্টানে মেতে থাকতেন। তিনি তখন অনেকের মানিকদা, অনেকের মানিক মামা, অনেকের মানিক চাচা। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বলতো মানিক চাচা আসলে ঈদের বখ্শীষ, মুসলমানির বখ্শীষ পাবো, গরীবরা বলতো একটা লুঙ্গী, শাড়ী বা ১০/২০ টাকা পাবো, তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যাবো। অনেকের থাকতো তাঁর কাছে অনেক প্রত্যাশা। তাঁর কথায়, তার সঙ্গে মেলা-মেশায় সবাই সন্তুষ্ট হতেন যদিও প্রত্যেকের উপকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতোনা।

তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অনেক। আমরা ছোট কয়েক ভাইয়ের লেখা-পড়া প্রায় পুরোপুরি তিনি-ই চালিয়েছেন। মাসের ১ম দিকে মানিকদা আমার পড়ার খরচ বাবদ সামান্য টাকা দিতেন যা দিয়ে আমি খরচ চালিয়ে মাসের শেষে কোন কোন সময় কিছু জমা থাকতো, অনেক সময় মাস শেষ হওয়ার আগে ওনার টাকা ফুরিয়ে গেলে তিনি হেসে আমার কাছে ধার চাইতেন, মাসের ১ম দিকে আবার ফিরিয়ে দিতেন। এই সময় আমরা কয়েক ভাই-বোন বিভিন্ন স্তরে লেখা-পড়া করতাম। লেখা-পড়ার পরপর চাকুরীর সংস্থান, বিয়ে ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে তিনি সব সময় চিন্তিত থাকতেন ও সমাধানের পথ খুঁজতেন। কোন ভাবেই যাতে বাবার উপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে এটাই ছিল তার চিন্তার মূল কারণ। আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী বা বন্ধু মহলের কারো কোন বিপদের কথা শুন্লে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হতেন ও সহানুভূতি জানাতে ছুটে যেতেন। পরিবারের সকলের অবস্থা খুটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, প্রয়োজনে সামর্থ অনুযায়ী সহায়তা করতেন। অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যেখানেই যান সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা ছিল তার নিয়মিত রুটিন কাজ।

মানিকদা'র মনোবল ছিল অসাধারণ, মারাত্মক বিপদেও তিনি কখনও ভেঙ্গে পড়তেন না। জীবনে তিনি বহুবার সড়ক দুর্ঘটনা ও পারিবারিক বিপর্যয় ইত্যাদিতে পড়েছেন, প্রতিবারই মনের জোরে সেরে উঠেছেন। শেষবারের মত তিনি যখন দুরারোগ্য "লিউ ক্যমিয়া" রোগে আক্রান্ত হলেন তখনও তিনি কাউকে এ খবর জানাতে চাইতেন না এবং সবাইকে বলতেন ইন্‌শাহ-আল্লাহ্ খুব শীঘ্র ভাল হয়ে উঠবেন। সুতরাং কেউ যেন তাঁর জন্য দুশ্চিন্তা না করেন। থাইল্যান্ডে "সিরীরাজ" হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় আমি তাঁর পাশে ছিলাম। ডাক্তারের কাছে জেনেছিলাম তাঁর রোগ ভাল হবার নয় তবে তার মনোবলের জোরে হয়তো তিনি কিছু দিন বেঁচে থাকবেন। তিনি উল্টো আমাদেরকে শান্তনা দিতেন ও তার জন্য যারা কষ্ঠ করছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেন। আমরা যারা তার কাছে ছিলাম তাঁদের খাওয়া থাকা নিয়ে কোন অসুবিধা যাতে না হয় তার জন্য তাগিদ দিতেন, মাঝে মাঝে আমাদেরকে এদিক সেদিক বেড়াতে ও কিছু কেনা কাটা করতে পাঠাতেন। ডাক্তার তাকে ছাড়তে চায়নি তবুও তিনমাস চিকিৎসার পর তিনি দেশের জন্য, চাকুরীর দায়ীত্বের জন্য অস্থির হয়ে উঠেন, তাই ডাক্তার বাধ্য হয়ে যেদিন 'ছাড়পত্র দিলেন সেদিন অত্যন্ত খুশী মনে আমাদের সঙ্গে দেশে ফিরলেন। সবাইকে বললেন উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন। তার মুখে দুশ্চিন্তার লেশমাত্রও ছিল না। কিন্তু আমরা জানতাম যে তার সুস্থতা সাময়িক ব্যাপার মাত্র।

ডাক্তারের পরামর্শ ছিল তিনি যেন অত্যন্ত নিয়মমাফিক চলেন ও অতিরিক্ত পরিশ্রম না করেন। কিন্তু পূনর্বার চাকুরীর দায়িত্বে ঢুকে তিনি কর্তব্য কাজে ডুবে গিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করা আরম্ভ করলেন। এতে তার শারিরীক দুর্বলতা প্রকাশ পেতে লাগলো। আমরা শংকিত হলাম কিন্তু তাঁর চোখে মুখে কোন রকম দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেল না। ভাবী ও ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম ওনাকে জোর করে রি-টায়ার করাবার জন্য, উনি কিছুতেই রাজী হননি। ইতিমধ্যে তাঁর পদোন্নতিতে উৎসাহ বেড়ে গিয়ে কাজের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলেন। ফলে যা ভেবেছিলাম তাই হলো।

ঢাকা থেকে উপর্য্যুপরি মিটিং সেরে চট্টগ্রাম ফিরলেন, বাসার দরজায় আমি তাঁকে সালাম করে মুখের দিকে তাকাতে আমার মন হঠাৎ শঙ্কায় ভরে গেল, তাঁর মুখে দেখলাম চরম ক্লান্তির ছাপ, রাত্রের মধ্যেই তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলা। হাসপাতালে থাকাকালীন তিনি এক একদিন তলিয়ে যেতেন, আমরা আত্মীয়, অনাত্মীয় সবাই রক্ত দিতাম আবার সাময়িক ভাল হয়ে উঠতেন। তখনও তাঁর কথাবার্তায় সংশয়ের লেশমাত্র দেখা যেত না, আমরা কাঁদতাম না কারণ এতে তার কাছে আমাদের দুর্বলতা ধরা পড়বে। কিন্তু একদিন কান্না ধরে রাখতে পারিনি যখন তিনি আমার কাছে মাফ চাইলেন এবং বললেন "There is a ghost in this room" তোমরা আমাকে বাসায় অথবা অন্য কামরায় নিয়ে যাও।" পরিষ্কার বুঝলাম তিনি এবার ভেঙ্গে পড়েছেন। আমি আমার সারা জীবনের ঋণ মাফ চাইলাম। মানিকদা জবাব দিলেন,

"Don't worry, You have been all along my golden brother". আমার পরম পাওয়া আমাকে দিলেন।

আমরা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। আমরা জানতাম না তাঁর অন্তিম সময় আসন্ন। শুক্রবার ৫ই জুন সকালে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। ইমাম সাহেবের কাছে দোয়া চাইলেন। ঐ দিন ঠিক জুম-আর আযানের সময় তিনি বিদায় নেবেন ভাবতে ও পারিনি। চোখের সামনে তাঁকে চলে যেতে দেখে নির্বাক হয়ে রইলাম।

আমার চাপাচাপিতে তাঁকে রাতের মধ্যেই দাফন করা হলো। রাত এগারটায় তার জানাজায় জনতার ঢল নেমেছিল। আমরা জিজ্ঞেস করি নাই "তিনি লোকটি কেমন ছিলেন?" যেহেতু গতানুগতিক এ প্রশ্ন মানিকদার ক্ষেত্রে ছিল বেমানান।

ডঃ শফিক আহমদ খান স্মরণে

ডঃ মোহাম্মদ কামাল হোসাইন
বন অনুষদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আসছে ৫ই জুন ডঃ শফিক আহম্মদ খান স্যারের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে কিছু কথা লিখতে গিয়ে আমার কর্ম জীবন শুরুর কথাই বেশী করে মনে পড়ে। প্রায় দুই বৎসর জনাব খানের সাথে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। স্বল্প সময়েই এই মহান ব্যক্তিত্ব আমাদের প্রত্যেককে যেভাবে আপন করে নিয়েছিলো সেটাতো কোন দিন ভুলবার নয়। তবুও আজ খান স্যারের সাথে বিজড়িত দুই একটি স্মৃতির কথাই আবার স্মরণ করছি।

ছাত্র জীবন শেষেই এই মহান ব্যক্তির সাথে আমার প্রথম কর্মজীবন শুরু। ১৯৮৪ সালের শেষের দিকের কথা। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সিলভিকালচার গবেষণা বিভাগে রিসার্চ অফিসার পদে যোগদান করেছি। ডঃ শফিক খান তখন সিলভিকালচারাল গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা। প্রথম সাক্ষাতেই এই জ্ঞানী ও মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষটির প্রতি মনের অজান্তেই শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছিলাম। এই সময়ে আমি, মনজু ভাই ও এহিউল সহ আমরা ৩ জন একই সাথে সিলভিকালচার গবেষণা বিভাগে যোগদান করি। জসীম ভাই আগে থেকেই এই বিভাগে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে আমাদের ৪ জনকে বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণার সার্বিক দায়িত্বভার দিয়ে তিনিই প্রথম এ বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তাদের কাজ করার সুযোগ

দিয়েছেলেন। বন গবেষণা সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাই আমরা পাই জনাব খানের কাছ থেকে। তত্ত্বীয় শিক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে জনাব খান আমাদেরকে নিয়ে দিনাজপুর, ঢাকা, টাংগাইল, সিলেট ও চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে ঘুরেছেন। তিনি গবেষণা কেন্দ্র সমূহের মাঠ পর্যায়ের বাস্তব সমস্যা সমূহ আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। অন্যদিকে সঠিক গবেষণা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনার কথা ও আমরা তাহার কাছ থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছি।

এ প্রসংগে একবার জনাব খানের সাথে আমি, জসীম ভাই, মনজু ভাই ও এহিউল সহ হাজারীখিল সিলভিকালচারাল গবেষণা কেন্দ্র ও তৎসন্নিহিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চল পরিদর্শনের কথা খুব বেশী করে মনে পড়ে। সেবার আমরা ২ দিন হাজারীখিলে ছিলাম। জনাব খানকে দেখেছি ঐ সময় কাজের ফাঁকে নিয়মিত নামাজ পড়তে। ঐ সময় তিনি আমাদের কত আপন ভাবেই না নিয়েছিলেন। খুব প্রত্যুষ্যে তিনি আমাদেরকে নিয়ে বন মোরগ ও হরিন দেখার জন্য বেরিয়ে যেতেন আর নাস্তার পর হাজারীখিলের পুরানো বাগান সমূহ ঘুরে ঘুরে দেখাতেন। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর সেই সব বনের নয়নাভিরাম দৃশ্য আমরা সত্যিই সেদিন উপভোগ করেছিলাম। সেবারই প্রথম আমি "জীব প্রার্চুয্য" সম্পন্ন একটি গভীর প্রাকৃতিক বনাঞ্চল পরিদর্শন করি যেটার প্রভাব আমাকে বন গবেষণা ও বন সম্পদ তথা গাছপালার প্রতি অনেক বেশী আকৃষ্ট করে।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

জনাব শফিক খানের সাথে আমার শেষ দেখা হয় সিলেটে। সেটা ১৯৮৯ সালের জুলাই মাস। তিনি তখন সিলেটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা। ব্যাংকক থেকে চিকিৎসা শেষে অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। আমি সহকর্মী মহিউদ্দিনসহ সপরিবারে সিলেট গিয়েছিলাম। অনেক আলাপ হয়েছে খান স্যারের সাথে বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশ বন গবেষণা ও আমার বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে। সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ আমি পি, এইচ, ডি করার জন্য বৃটেনে চলে যাই। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে আমি দেশে ফিরি। মাঝখানে ৩টি বৎসর হাজারো কাজের মাঝে প্রচন্ড ব্যস্ত ছিলাম। এরি মধ্যে আমি আমার মা ও বাবাকে চিরদিনের জন্য হারাই। মা ও বাবা হারানোর শোকের মাঝে আমি আবারো যে দুঃসংবাদটা পাই সেটা হচ্ছে ডঃ শফিক খানের মৃত্যু। মা ও বাবার মৃত্যুতে আমি যেভাবে শোকাভিভূত হয়েছিলাম, জনাব খানের মৃত্যুতে ও ঠিক সেরকম আহত হয়েছি। "জন্মিলেই মরিতে হইবে" এ অমোঘ সত্য আমাদের সবাইকে মেনে নিতে হবে। এ সত্যকে মেনে নিয়েই আমি এখনো সে সব বেদনা ভুলে থাকতে চাই।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে আমাদের শুধুই প্রার্থনা আল্লাহ যেন জনাব শফিক খানকে বেহেশ্‌ত নসীব করেন এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে এ বেদনা সহ্য করার মত শক্তি দেন। জনাব খানের ব্যক্তিগত মহৎ গুণাবলী যেন আমাদের সবাইর মাঝে প্রতিভাত হয় এটাই আজ ডঃ খানের মৃত্যু বার্ষিকীতে আমার কামনা।

ডঃ শফিক আহমদ খাঁন স্মরণে

এ, এম, এম, নুরুল আলম
বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল,
বন পাহাড়, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।

বিগত ৫ই জুন শফিকের মৃত্যু-বার্ষিকী ছিল। শফিকের ডাক নাম মানিক। শফিক শুধু চাকুরীতে আমার বেচ্‌মেট ছিল না। আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুও ছিল। আমি তাকে "মাইনক্যা" বলে ডাকতাম।

মাইনক্যার সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ১৯৫৬ সনে। আমার এবং মাইনক্যার রসায়ন বিষয় ছিল কমন। তাই ঐ ক্লাসে একত্রে ক্লাস করতাম। অত্যন্ত শান্ত মেজাজের, কথা বার্তায় রসিক এবং ভাল "ভজন" গাইতো।

বন বিভাগে তার যোগদানের ব্যাপারে আমার আজ স্মৃতি থেকে একটা কথা বার বার মনে হয়।

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে এবং ষাটের দশকের প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সমস্ত ছাত্র পাশ করেছেন তাঁদের মনে থাকার কথা- বঙ্গবন্ধু এভেনিয়্যুতে- ঠিক বর্তমানের রমনা ভবনের কাছাকাছি একটা রেষ্টুরেন্ট ছিল নাম- "লাসানি"। সেখানে সন্ধ্যার দিকে যে সমস্ত ছাত্ররা সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস/ কিংবা অন্য যে কোন প্রথম শ্রেণীর চাকুরীর অপেক্ষায় কিংবা প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁদের আনাগোনা ছিল বেশী।

১৯৬১ সনের মে কিংবা জুন মাসে কোন এক সন্ধ্যায় শফিকের সাথে আমার "লা সানিতে" দেখা। দু'জনে চা খাচ্ছিলাম। কথা প্রসঙ্গে আমি বললাম। সুপেরিয়র ফরেষ্ট সার্ভিসের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির কথা। তদানুযায়ী তদানিন্তন ষ্টেট ব্যাংকে (ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত) টাকা জমা দেয় শফিক।

পরবর্তীতে আমরা দু'জনই মনোনীত হয়ে ১৯৬১ সনের অক্টোবরের ৬ তারিখ ঢাকা থেকে লাহোর পৌঁছি, তখনকার দিনের সুপার কনষ্টালেশন বিমান যোগে। আমরা ছয়জন ছিলাম। মরহুম বন্ধুবর শফিক, আমি, আলী আকবর ভুঁইয়া, মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, নুরুল ইসলাম হাওলাদার এবং মোহাম্মদ আবদুল বাসেত। মহিউদ্দিন পরে পেশোয়ারে আমাদের সাথে একাডেমীতে যোগ দেয়।

আমাদের প্রশিক্ষণ আরম্ভ হয় অক্টোবর- ১৯৬১ সন হতে। অনেক সময় সারাদিন ক্লান্তির পর সন্ধ্যায় শফিককে বলতাম, একটা গান গেতে। চা খেতে খেতে দরাজ গলায় রবীন্দ্র সংগীত গাইত। অনুরোধ করতাম দু'একটা চুটকী পরিবেশন করতে।

আরও বহু হারানো দিনের কথা আজ শফিকের অবর্তমানে মনে পড়ে। লিখলে উপন্যাস লেখা যায়। ডঃ শফিকের অকাল মৃত্যুতে শুধু পরিবারের জন্য নয় আমিও এক নিকটতম বন্ধুকে হারিয়েছি।

তার সাথে আমার শেষ দেখা- তার মৃত্যুর আনুমানিক মাস দেড়েক আগে প্রধান বন সংরক্ষকের কক্ষে বাজেট সংক্রান্ত সভায়। এপ্রিল ১৯৯২ সনে। সভার পর আমি শফিককে তার এক আত্মীয়ের মোহাম্মদপুরস্থ বাড়ীতে নামিয়ে দেই। সেই শেষ দেখা। তারপর হঠাৎ করে ৫ই জুন টেলিভিশনে ৮টার খবরে তাঁর ছবি দেখি। শুনি তাঁর মৃত্যু সংবাদ। আল্লাহ্ তাঁর হেফাজত করুন।

আমার প্রিয় আব্বু

জাহিদ আদনান খান (রুবাব)

আব্বু আমার, আব্বু সোনা,
কারো সাথে হয়না তুলনা।
আব্বু আমার হীরে মানিক,
আব্বু, আমার রাজার রাজা।
ফাঁকি দিয়ে চলে গেল-
কোথায় বল না?
আব্বু তোমায় ভালবাসি,
আমি, দোলা, রনি, পুষি,
দোয়েল, কোয়েল, ময়না, টিয়ে
গাছপালা আর-
বনের যত ফুল।
সূর্য, তারা, চাঁদের আলো
পাহাড়, নদী, ঝর্ণা ধারা-
আর যে তৃণমূল।

IN MEMORY OF DR. S. A. KHAN

Nurul Islam Howlader
Conservator of Forest
Monitoring and Evaluation Cell
Thana Afforestation & Nursery Dev. Project
Bana Bhaban, Mohakhali, Dhaka, Bangladesh.

It was as far back as 1958 when I came in touch with Mr. Shafique Ahmed Khan when we were students of M.Sc (preliminary) class of Biochemistry of the famous Dhaka University. We read together for two consecutive years and obtained M.Sc. Degree in Biochemistry in the year 1960. After obtaining M. Sc. degree in Biochemistry, we again together joined the then East Regional Laboratory of the then East Pakistan located at Tejgaon Industrial area as research fellows. (Now it is well-Known as Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BOSIR) located in its new site at Dhanmondi, Dhaka).

While working as research fellows (I was working under late Dr. NA. Khan & my bossom friend Mr. S. A. Khan was working under late Dr. H.N.De) in the then East Regional Laboratory, Dhaka for about a year, incidentally and luckily both of us got a chance to appear before the then East Pakistan (Now Bangladesh) public Service Commission for recruitment as stipendary students for the then East Pakistan Superior Forest Service for undergoing a 2-year study-cum-training course in Pakistan Forest Institute, Peshawar, under Peshawar University.

hunati.com
Pioneer in Village based website

After successfully qualifying in the aforesaid training course in 1961 from the Pakistan Forest Institute, Peshawar, both of us along with 5 (five) others joined the then East Pakistan Senior Forest Service in October, 1961 as probationary ACF. Incidentally both of us again joined in Chittagong Forest Division for undergoing range training.

Mr. S. A. Khan later on obtained his D.Sc. degree from former Yugoslavia and attended many national and international seminars both at home and abroad and earned a good reputation for the country in general and the forest department in particular.

From then onward, we served together in many occasions in the same station and sometimes in the neighbouring stations till his sad and untimely sudden demise on 5th June, 1992.

He was an all-the-time smiling man and too much courteous to his colleagues. He was well-Known for his presence of mind and graceful behaviour to overcome any adverse situation in his friends circle. He was locally and popularly Known as "Manik Mia" meaning a Jwell" in his friends' circle. He had a brilliant academic career and that is why he was really worthy of his nick name of "Manik" Mia.

While studying together in Dhaka University, we very often used to go together to his reverend aunt poetess Begum Sufia Kamal for having our launch with her and also for gossiping with her children.

We had a special bond of friendship since 1958 till his death. Even while studying in Pakistan Forest Institute, Peshawar, we used to live in the same room as room mate. While he was in Holy Cresent Hospital in Chittagong under treatment during his serious illness, I went to Chittagong 4 times to see my this ailing friend. On hearing the bad news of his sad demise, I rushed to Chittagong availing Mahanagar Purabi train to pay my last respect to him. But on reaching Chittagong, I came to know that his dead body has been taken to his village home at Chunati in Lohagara Thana under Chittagong District for burial. Even at this stage, without taking any rest, I rushed to Chunati to attend his burial. But due to ill-luck, before about half an hour of my arrival at Chunati, (I reached chunati at about 01 A. M. at night) his dead body was burried by the side of his parent's graves.

I am personally shocked at his untimely death because I made over charge of the office of Conservator of Forests, Chittagong Circle to him on 15th April, 1992 and he breathed his last on 5th June, 1992. His sad demise is a great personal loss to me.

May the Almighty Allah grant him an eternal peace. As " Man is mortal" May Allah the Almighty, grant the members of his family the moral courage and strength to bear this irreparable loss.

Ameen ! !

স্মৃতির পাতা

মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন
বন গবেষণাগার, চট্টগ্রাম।

মরহুম ডঃ শফিক আহমদ খান এর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৮২ ইংরেজীর শেষের দিকে। আমি তখন চরকাই বন গবেষণা কেন্দ্রে (দিনাজপুরে) কর্মরত। দিনাজপুরেই অফিসিয়াল চিঠি পেয়েছিলাম ডঃ এস, এ, খান সিলভিকালচার গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর সাথে দেখা হওয়ার আগেই দিনাজপুর বন বিভাগের অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছে জেনেছিলাম তাঁর ব্যক্তিত্ব, মহত্ব, উদারতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে অনেক কথা।

মাসের শেষে সরকারী কাজে চট্টগ্রাম বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটে এসে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কক্ষে প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে স্নেহাসিক্ত করে আপন করে নিয়েছিলেন সদ্য পি, এইচ, ডি করে আসা সহজ, সরল, নিরহংকার, মিষ্টভাষী ও প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এ মানুষটি। আমার প্রতি তাঁর সেই স্নেহ, ভালবাসা ও বিশ্বাস আমৃত্যু অটুট ছিল। পরবর্তী সময়ে কাজের মাধ্যমে আমি তার একান্ত সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পেয়েছি। সরকারী কোন কাজ হাতে পেয়ে কালকের জন্য তিনি ফেলে রাখেননি। কাজ হাতে আসার সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

গবেষণা কাজে আমি এই নিরলস ও পরিশ্রমী কর্মকর্তার সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। চরকাই, মধুপুর, শ্রীমংগল, সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান প্রর্ভতি বনাঞ্চলে তিনি আমাদের সাথে মাঠে বসে কাজ করেছেন। চরকাই ও চারালজানি গবেষণা কেন্দ্রে তিনি আমাদের সাথে একনাগাড়ে ১৪-১৫ দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে বসে গবেষণা প্লটের উপাত্ত সংগ্রহের কাজ করেছেন। সেই উপাত্তের উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশে বনায়নের জন্য ইউক্যালিপটাস প্রজাতির সম্ভাবনা সম্পর্কে সর্বপ্রথম রচিত ও প্রকাশিত হয় তথ্যবহুল গবেষণা প্রবন্ধ।

শ্রীলংকার কেন্ডি-তে 'নার্সারী পদ্ধতি" বিষয়ে সেমিনার হবে। আন্তর্জাতিক এ-সেমিনারে অংশ গ্রহণের দাওয়াত পেয়েছেন ডঃ খান। "দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রচলিত নার্সারী পদ্ধতি"-এর উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করার দায়িত্ব পড়েছে তাঁর উপর। প্রবন্ধ লিখার কাজে হাত দিলেন ডঃ খান। এ বিষয়ে সহায়তা করার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন। গ্রন্থাগার হতে এ বিষয়ে আমি রেফারেন্স সংগ্রহ ও তাঁর নির্দেশ মতো প্রবন্ধের খসড়া তৈরী করতে লাগলাম। সেই খসড়া ডঃ খানের পরশে মুক্তা হয়ে ফুঠে উঠে। এ কাজের ব্যস্থতার মধ্যেই ডঃ ভেভিডসন (ইউএনডিপি/এফ.এ.ও উপদেষ্টা) চরকাই বন গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শনে যাবেন বলে চিঠি আসল। ডঃ খানকে দিনাজপুর উপস্থিত থাকতে হবে। তিনি বিলম্ব না করে প্রয়োজনীয় বই-পত্র এবং আমাকে সাথে নিয়ে দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। চট্টগ্রাম থেকে দিনাজপুর লাইনের ট্রেন

পাওয়া গেল না, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা গেলেন। সন্ধ্যায় আমাকেসহ ইকবাল রোডে ভায়রার বাসায় উঠলেন। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে রাতে আবার দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠলেন। ট্রেনে বসে অনেক রাত পর্যন্ত নার্সারী পদ্ধতি বিষয়ক বহু গবেষণা প্রবন্ধ পড়লেন এবং কিভাবে লিখতে হবে আমার সাথে আলোচনা করলেন। ঢাকা-থেকে দিনাজপুর যাওয়ার এ দীর্ঘ পথে তিনি অধিকাংশ সময় বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ পড়ে এবং কিভাবে লিখতে হবে তার পরিকল্পনা করে কাটিয়ে দিলেন। পরের দিন সন্ধ্যা ছয়টায় আমরা দিনাজপুর পৌছলাম। ট্রেন থেকে নেমে রিক্সায় চেপে দু'জনে জনাব আশরাফুল ইসলাম, ডি এফ, ও, দিনাজপুরের বাসায় গেলাম। আশরাফ সাহেব তার গাড়ীতে করে আমাদের রামসাগর রেষ্ট হাউসে পৌছে দিলেন। সামান্য কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে জনাব খান আবার পড়তে লাগলেন এবং কয়েকটি বিষয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আমাকে ডিকটেশন দিলেন। পরের দিন সৈয়দপুর বিমান বন্দর হতে ডঃ ডেভিডসন রামসাগরে আসলেন এবং আমরা একসাথে চরকাই গবেষণা কেন্দ্রের পরীক্ষামূলক বাগান পরিদর্শন করলাম। সন্ধ্যায় রামসাগর পৌছে কিছু সময় বিশ্রামের পর রাতের খাবার শেষে অনেক রাত পর্যন্ত আমাকে ডিকটেশন দিলেন। পরের দিন ভোরে ডঃ ডেভিডসনের গাড়ীতে মধুপুরের উদ্দেশ্যে দিনাজপুর ত্যাগ করলাম। বিকাল পাঁচটার দিকে আমরা চারালজানি গবেষণা কেন্দ্রে পৌছলাম। রাতের খাবার শেষে 'দোখোলা' ফরেষ্ট রেষ্ট হাউসে গেলাম। এখানে ডিজেল জেনারেটর চালিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু রেষ্ট হাউসের পাহারাদার এসে জানাল- যে পরিমান ডিজেল আছে তাতে মাত্র ঘন্টা দুয়েক জেনারেটর চলবে। খান সাহেব মুহূর্তে বিলম্ব না করে বই পত্র নিয়ে বসে গেলেন। আমাকে ডিকটেশন দিলেন। ঐ দিন আমি এত ক্লান্ত ছিলাম যে, খান সাহেবের ডিকটেশন আমার কানে যাচ্ছিল না। আমার সমস্ত নার্ভ যেন অচল হয়ে গিয়েছিল। আমি কলম হাতেই ঢলে পড়েছিলাম। ঐ ঘটনাটি খান সাহেব কোন দিনই ভুলেন নাই এবং তার খুশীর দিনে তিনি আমাকে সব সময় স্মরণ করেছেন।

সিলভিকালচারাল গবেষণা বিভাগে আমরা ডঃ খানের অধীনস্থ কর্মকর্তা ছিলাম। আমাদের প্রতি তিনি কোন দিনই "বস" এর মত আচরণ করেন নি। আচরণ করেছেন দায়িত্ববান একজন বড় ভাইয়ের মত। আমরা তাঁকেও জেনেছি একজন পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের মত। আসলে গবেষণা কর্মীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও শিক্ষক সূলভ আচরণই শ্রেয়- হয়তো ডঃ খান তাঁর প্রজ্ঞা ও মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে এ সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমাদের দুঃখে তিনি দুঃখ পেয়েছেন, পরম স্নেহে সান্তনার বাণী দিয়েছেন, সুখে আনন্দিত হয়েছেন। বিশেষভাবে মনে পড়ে আমি, কামাল, এহিউল-সিলভিকালচার গবেষণা বিভাগের তিনজন গবেষক শুলকবহরের এক ছোট্ট বাসায় ভাড়া থাকতাম। ডঃ খানের টেবিলে কাজ করার সময় হঠাৎ আমার প্রবলভাবে জ্বর আসল। তিনি কামাল ও এহিউলকে আমার সাথে দিয়ে তার গাড়ীতে প্রথমে ডাক্তার এর কাছে, পরে বাসায় পৌছে দিলেন। পরের দিন বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির দিনে শুলকবহরে বাসায় যাওয়া কষ্টকর ব্যাপার ছিল। খান সাহেব অনেক কষ্ট করে আমাকে বাসায় দেখতে গিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এবং চিরদিন কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করলেন।

ডঃ খানকে সব সময় নামাজ আদায় করতে দেখেছি। একসাথে ভ্রমণে গেলে তিনি ইমাম হয়ে নামাজ আদায় করেছেন। কোন গরীব ও অসহায় লোককে তাঁর কাছে হাত পেতে খালী হাতে যেতে দেখি নি। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের মানুষ। বড় ধরনের অপরাধের পরেও তিনি অনেক গরীব কর্মচারীকে শুধুমাত্র সতর্কবাণী উচ্চারণ করেই ক্ষমা করেছেন। তিনি চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে অধঃস্থন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছ হতে কাজ আদায় করেন নি। তিনি আমাদের মন জয় করেছেন স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে এবং আমরা মন জয় করতে চেয়েছি মেধার প্রয়োগ ও পরিশ্রম দিয়ে। তিনি ছিলেন একজন মেধাবী গবেষক ও একজন সফল প্রশাসক। সর্বোপরি তিনি ছিলেন মানবীয় গুণে গুনান্বিত একজন সফল মানুষ। জনাব খান আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি চলে গেছেন দুরে, অনেক দুরে, যেখানে চলে গেলে মানুষ আর কোন দিন ফিরে আসে না, ফুলে ফলে সুশোভিত মর্ত্যের এই পৃথিবীতে। কিন্তু তিনি নিজের অনির্বান দিপ্তীতে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় জুড়ে বসে আছেন।

আগামী ৫ই জুন ডাঃ খানের মৃত্যু বার্ষিকী। মহান আল্লাহর দরবারে বিনীত প্রার্থনা জানাই আল্লাহ্ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন।

আমার দেখা ঃ ডক্টর শফিক আহমদ খাঁন

মহিবুল হক
ডেপুটি রেঞ্জার, সিলেট।

পত্রখানা প্রয়াত ডঃ এস, এ, খাঁন, প্রাক্তন বন সংরক্ষক, ইষ্টার্ণ সার্কেল, বাংলাদেশ-এর লেখা। লেখাটি সিলেট বন বিভাগে তাঁর কর্মরত থাকাকালীন সময়ের প্যাডে আমার বরাবরে লেখা হয়েছিল। এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন "My Family and I personally shall remember all the love gives us by Sylhet- people in general and you in particular" সিলেটের লোক তাঁকে কতখানি ভালবাসত এ পত্রখানা তাঁর প্রমাণ।

এই লেখাটি আমার কাছে এক পবিত্র দলিলের মত মিষ্টি স্মৃতিতে আবিষ্ট। ওনাকে নিয়ে আমাকে লেখতে হবে একথা কোন দিনই আমার মনে আসে নি। সে দিন যখন মিসেস খাঁনের লেখা একটি চিরকুট আমার হস্তগত হল তখন বুকটা ব্যাথায় চিনচিন করে উঠল, আর এই পত্রের কথা মনে হল।

সিলেট তাঁকে কতখানি দিয়েছে জানি না, কিন্তু সিলেট তাঁর মত এক বিদগ্ধ মহৎ প্রাণ ব্যক্তির সংস্পর্ষে এসেছিল। এ গর্ব সিলেটের। ক্ষমতা মানুষকে দানবে পরিণত করতে পারে, কিন্তু ক্ষমতার সপ্রেম প্রয়াগ মানুষকে যে কতখানি মানুষে পরিণত করতে পারে ডঃ খাঁন ছিলেন তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

সিলেট বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে আমি তাঁর একান্ত সন্নিধানে আসি। বাংলাদেশ বন বিভাগে কর্মরত একজন চাকুরীজীবি হিসাবে, ৫ -১০˝ উচ্চতার এই সুদর্শন কর্মকর্তাকে আমি পূর্ব থেকেই জানতাম, কিন্তু সিলেটে তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

কেমন ছিলেন ডঃ শফিক আহমদ খাঁন? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁর একান্ত মানুষদের চাইতে তাঁর সমালোচকদেরই দেয়া উচিৎ বেশী করে। কেননা যারা তাঁর গুণমুগ্ধ তাদের কাছে হয়ত ডঃ খাঁন একজন ফেরেশ্তা তুল্য মানুষ, কিন্তু তাঁর সমালোচনাকারীও হয়ত আমার সাথে একমত হবেন যে, ডঃ খাঁন ছিলেন এক নির্বিরোধী, উদার প্রাণ, হৃদয়-সৌন্দর্যে আলোকিত এক অনন্য সুন্দর ব্যক্তিত্ব।

সিলেট বন বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হিসাবে ডঃ খাঁনের দুরূহ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের সময়ে বিভিন্ন সংগ্রাম ও সংকটে, কিংবা তাঁর দুর্ভাবনাহীন দিনগুলিতে তারই একজন অধঃস্তন হিসাবে তাঁর সাথে কাজ করতে হয়েছে। বিভিন্ন কাজ কর্মের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আমি যেমন তাঁর একান্ত সন্নিধানে আসছিলাম, তিনিও তেমনি আমাকে অধিকতর বিশ্বাসী বলে অবিহিত করছিলেন, আর তার এই বিশ্বাস আমাকে নিদারুন শারীরিক শ্রমে নিয়োজিত করে তুলছিল। তাঁর বিশ্বাস আমাকে অধিকতর সচেতন ও শংকাযুক্ত করছিল, কেননা কোথাও আমার ছন্দপতন তাঁকে

আঘাত করবে; যা কিনা বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দিতে পারে। এ ছিল আমার ভয়, কিন্তু আমি সে ভয় অতিক্রম করতে পেরেছিলাম।

সময়ের প্রতি তাঁর ছিল এক প্রগাঢ় নিষ্ঠতা। মাঠ পর্যায়ের কাজ কর্মের দেখাশুনা করে, প্রাত্যহিক দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করতে করতে অনেক সময় গভীর রাত হয়ে যেত। তিনি নিরলসভাবে তাঁর চেম্বারে কাজ করে যেতেন। যাওয়ার সময় আমাকে বলতেন "সকাল ৭-০টায় আসবে" আমি আসতাম, আমি জানতাম সময়ের হেরফের কে তিনি বড় ঘৃনা করেন।

একবার আমার জ্বর হয়েছিল তাঁর কথামত সময়ে অফিসে আসতে পারিনি। বেশ বেলা করে অফিসে আসলে তাঁর অর্ডালী আমাকে জানাল "সাহেব খুঁজছেন"। আমি তাঁর চেম্বারে ঢুকলাম সেখানে মিটিং চলছিল। তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, "তুমি বাড়ী যাও, এবং বিশ্রাম কর" আমার দিকে চেয়ে তিনি আমার অসুস্থতা বুঝতে পারছিলেন। জলদগম্ভীর, ভরাট গলার সেই আওয়াজ আজ আমার কাছে স্মৃতি, বড় আনন্দের, বড় বেদনার।

সিলেট বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষক, প্রয়াত সাফায়েত আহমদ খাঁন যখন খুব অসুস্থ। দেখলাম তখন ডঃ খাঁন চতুর্দিকে চিঠিপত্র লিখছেন, অনেক বিজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছেন, বিভিন্নভাবে তাঁর সুচিকিৎসার জন্য সচেষ্ট হয়ে তাঁকে বম্বে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টাকে পিছনে ফেলে এ, সি, এফ সাফায়েত আহমদ খাঁন চলে গেলেন পরপারে। স্তম্ভিত, বিমূঢ় ডঃ খাঁনকে দেখলাম বেদনায় নীল হয়ে গেছেন। কি দারুন ছিল তাঁর ফেলো ফিলিং।

সেই থেকে তিনি কেমন হয়ে গেলেন। তাঁর বিমর্ষতাকে কাজ কর্মের আবরণে ঢেকে রাখতেন, কখনও তা প্রকাশ করেন নি। তিনি প্রচন্ডভাবে ধার্মিক ছিলেন। তাঁর বাংলো বাড়ীতে প্রায়ই গরীব মিছকিনদের খাওয়াতেন। এদেরকে খাইয়ে তিনি যেন কেমন তৃপ্তি পেতেন।

ডঃ খাঁন সুদীর্ঘ সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে কর্মরত ছিলেন। তাঁর ছিল প্রাজ্ঞতা, কর্মের প্রতি ঐকান্তিকতা এবং জীবনের প্রতি এক সহজ সরল অভিব্যক্তি। মানুষকে জানার এবং বুঝার এক অসাধারণ গুণ তাঁর মধ্যে ছিল, যা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। অত্যন্ত উঁচুমানের মানষিকতা তিনি বহন করতেন, হীনমন্যতাকে প্রচন্ডভাবে ঘৃণা করতেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মনন তাঁকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল। সকল উদ্দেশ্যই তাঁর চোখে ধরা পড়ত। সেইভাবেই তিনি সকল সমস্যার সমাধানে ব্রতী হতেন।

আমি তাঁকে যতটুকু দেখেছি তাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছিল-তিনি ছিলেন একজন স্নেহপ্রবা পিতা, অত্যন্ত দায়িত্ববান স্বামী এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অসাধারণ দক্ষ এক চৌকস ফরেষ্ট অফিসার। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন চট্টলার চুনতি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। তাঁর আচার-আচরণে তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদে, দৈনন্দিন কাজ কর্মে সেই আভিজাত্য বোধ প্রকাশ পেত। এত সব মানবিক গুণাবলীর

অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল সীমিত। তিনি কোন বাড়ী তৈরী করে যেতে পারেন নি। আজও তাঁর পরিবার চট্টগ্রামের বন পাহাড়ের সরকারী বাসভবনে অবস্থান করছেন। এ এক আশ্চর্য বিধিলিপি!

একবার ডঃ খাঁন আমাকে সিলেট-তামাবিল রাস্তার পার্শ্বে জনৈক চা-বাগানের সুপারিনটেনডেন্ট-এর একটি বাসা বাড়ীর নমুনা প্ল্যান সংগ্রহের জন্য বলেছিলেন। বাড়ীটির নাম ছিল "কপোত" আমি সে প্ল্যান তৈরী করি। কিন্তু সেই বাড়ীটি তৈরী করা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

একবার ঢাকা গেলেন। বার্ডেমে তাঁর রক্ত পরীক্ষা করা হল। লিক্যুমিয়ার ট্রেস পাওয়া গেল। কিন্তু তিনি নির্বিকার থাকলেন। দেশের বাইরে গেলেন। সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক কাজ কর্মের মধ্যে আবার ডুবে গেলেন। এর মধ্যেও তাঁর একটি বিষাদঘন ছবি নজরে আসত। যা শুধুমাত্র দেখারই ছিল না, অনুভূতিরও বিষয় ছিল।

সরকারী চাকুরী জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে সিলেট বন বিভাগ থেকে তাঁর বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসল, তিনি বদলী হয়ে গেলেন চট্টগ্রামে। তাঁর ফেয়ার ওয়েল মিটিংটি ছিল সম-সাময়িক সিলেটের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সকল ফেয়ার ওয়েলের চাইতে অনন্য সাধারণ। সিলেটের তৎকালীন সকল প্রাজ্ঞজনই এই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। ধরা গলায় ডঃ খাঁন সেদিন বলেছিলেন "সাধু-সন্তের এই দেশটিকে আমার বড় ভাল লাগে"।

সিলেট ছাড়ার মুহূর্তে তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন "আমি আবার আসব"। সরকারীভাবে তিনি সুরমা ভেলী থেকে বিদায় নিলেন, কিন্তু হৃদ্যতায় পাকাপোক্ত করে গেলেন তার আসন, পবিত্র এই মাটির বুকে।

সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদে সমাসীন, অনেক বিজ্ঞজনরাই নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখেন আপন আপন বলয়ে। কিন্তু সেই বলয় থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণের সুখ-দুঃখের সাথী হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আগাগোড়াই ডঃ খাঁন ছিলেন একজন মানুষ এবং বড় বেশী করে মানবিক। তাঁর এক অস্বাভাবিক ইনটুইশন ছিল যা দিয়ে তিনি মানুষকে চিনতেন।

শেষবারের মত আমি তাঁকে দেখেছিলাম বন সংরক্ষক হিসাবে চট্টগ্রাম বন পাহাড়ে অবস্থিত তাঁর বাংলোয়। আমি তখন নানাভাবে বিড়ম্বিত। তিনি আমাকে সাহস দিয়েছেন ধৈর্য্য ধরতে বলেছিলেন। সেই সময় তাকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি বেশ অসুস্থ। জিজ্ঞাস করলে তিনি বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে ভালবাস, তাই তোমাদের চোখে আমি সব সময় অসুস্থ"। সেদিন তিনি কক্সবাজার থেকে সবেমাত্র একটি সরকারী ট্যুর শেষ করে এসেছেন। বললেন থাকার জন্য। কিন্তু আমার তাড়া ছিল, আমি চলে এলাম। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি বলেছিলেন "দেখা হবে"।

না-আর দেখা হয় নি। অসংখ্য, অগণিত স্মৃতির মধ্যে সেই গ্রীষ্মের দুপুরে, শান্ত সমাহিত বন পাহাড়ের বৃক্ষাদির নির্জনতায় আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে

এসেছিলাম। এর মাত্র পনের দিন পর তিনি চট্টগ্রামের একটি ক্লিনিকে ইহধাম ত্যাগ করেন।

তিনি আমাকে কিন্তু বলেছিলেন, "দেখা হবে"। কিছুই তো হারাবার নয়। এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে রূপান্তরিত হওয়াই আত্মারধর্ম। তবে কি দেখা হবে? কোথায়? কখন? তিনি যে আমাকে বড় স্নেহ করতেন!

আমার দেখা বাবাকে

নাফিস আহমদ খান (রজত)
সাব-লেফটেন্যান্ট
বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী

গল্প ঃ ১ - ১৯৬৫-৬৬ইং। তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার, নারায়ন হাট নামক বনাঞ্চলের উপবিভাগীয় বন কর্মকর্তা। বন বিভাগের ডাক বাংলোয় তাঁর আবাস। বাহন সাইকেল। অত্র ও তৎসংলগ্ন সকল এলাকায় বন রাজা নামে তাঁর পরিচিতি। ডাক বাংলোর উপজাতীয় এক চৌকিদার একদিন মাঝরাতে কড়ানাড়ে। হেতু- তার স্ত্রী প্রসব বেদনায় ব্যাকুল। তৎক্ষণাৎ উক্ত বনরাজা নিজ হাতে নাওয়ের বৈঠা নিয়ে দুর্গম পথ ও নদী পাড়ি দিয়ে তাদের পৌছে দিয়ে এলেন শহরের মাতৃসদনে। জনমন ও প্রকৃতি স্বয়ং আলোড়িত হল সামান্য চৌকিদারের প্রতি সাহেবের এই অসীম দয়ায়। তাদের নিশ্চুপ কথপোকথনের সারমর্ম ছিল, সাহেবের ঐশ্বর্য্যের ভান্ডার সীমিত হলেও দয়ার ভান্ডার অসীম।

গল্প ঃ ২ - ১৯৭২-৭৩ সাল। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা থেকে নদী পথে প্রায় ৭০ মাইল পথ, ভারত সীমান্তের সন্নিকট। এক রাতে বনবিভাগের লঞ্চে বিশ্রাম নিচ্ছেন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা। হঠাৎ দূর্ধর্ষ ডাকাত দলের আক্রমন হল লঞ্চে। অথচ, ডাকাত দলের সর্দার সেই ফরেষ্ট অফিসারের নাম শোনা মাত্র উক্ত স্থান ত্যাগ করল। কেন সেই ডাকাত লঞ্চে প্রবেশ করলো না, তা আজ অবধি কেউ জানতে পারেনি, কেবল উপলব্ধিই করেছে।

গল্প ঃ ৩ - ১৯৬৬-৬৭ সাল। কক্সবাজার অঞ্চলের ডাকসাইটে ডাকাত সর্দার কাশেম রাজা ও তার বিশাল ডাকাত দল চলেছে সমুদ্র সৈকত ধরে। হঠাৎ সামনে মুখোমুখি হল অপর এক জীপের। কাশেম রাজা তার লোক মার্ফত জানতে চাইলো গাড়ীর আরোহীর পরিচয়। পরিচয় জানা মাত্র তার সম্পর্কে পুষে রাখা সব ধারণা ভুল প্রমাণ করে সে উক্ত জীপ আরোহীকে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো। কথিত ছিল, স্বয়ং মৃত্যুদুত আজরাইলের হাত থেকে রক্ষা পেলেও কাশেম রাজার হাতে কারো নিস্তার নেই।

আমার উপরের কথাগুলোকে গল্প-১, গল্প-২, গল্প-৩ না বলে, সত্য-১, সত্য-২, সত্য-৩ বলা উচিৎ। কারণ কিছু কিছু লোকের জীবন এত বেশী বৈচিত্রময় এবং উদ্যমতায় পূর্ণ যে, তাদের কোন ঘটনাকে গল্প বলে আখ্যা দিলে একই সাথে সত্য ও বৈচিত্রকে উপহাস করা হয়। সে সাহস আমার নেই। নেই সে যোগ্যতা, যাঁর সম্পর্কে কিছু কথা বললাম এতক্ষণ, তাঁর জীবনী লিখার।

তিনি হচ্ছেন মরহুম ডঃ শফিক আহমেদ খান– আমার প্রিয় বাবা।

আমার বাবা'র ছাত্রজীবন, কর্মজীবন কিংবা চারিত্রিক গুণাবলীর কোন কিছুই এত অল্প কথায় লিখা সম্ভব নয়, সেই অপচেষ্টা আমি করবো না। শুধু ক'টি কথা বলবো ঃ একজন লোক একই সাথে এতবেশী লোকের, এত বেশী রকম ভালবাসা পেতে পারেন তার প্রমাণ আমার চোখে কেবল আমার বাবাকেই পেতে দেখেছি। বাবার কাছে কিছু না চাইতেই অনেক পেয়েছি, কিছু চাইলে যা চেয়েছি তার দ্বিগুণ পেয়েছি। বাবার এই উজাড় করে দেয়া ভালবাসা আজ আমায় সন্দিহান করে তোলে, হয়তো তিনি ঠিকই জানতেন বেশীদিন বেশী কিছু দেবার মত সময় তাঁর নেই। এ যেন পূর্ব পরিকল্পিত পদক্ষেপ মাত্র। না, বাবার উপর এ আমার অভিমান নয়-- কিছু বলবার অভিপ্রায় মাত্র।

* * *

ডঃ শফিক আহমদ খান
আমাদের সাহস ও প্রেরণার উৎস

হেলালউদ্দিন মোঃ আলমগীর
ইঞ্জিনিয়ার
জালালাবাদ গ্যাস সিস্টেমস্ লিঃ, সিলেট

হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালের একটি জনাকীর্ণ কক্ষ। প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসছে অগনিত মানুষ তাদের প্রিয় মানুষটিকে এক নজর দেখতে। একজন বীরপুরুষ তিলে তিলে এগিয়ে যাচ্ছেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। তিনি ডক্টর শফিক আহমদ খান। বীর চট্টলার ঐতিহ্যবাহী চুনতি গ্রামের ডেপুটি বাড়ীর সন্তান। বন বিভাগের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। ক্রমেই হাসপাতালে ভীড় বাড়ছে। একটানা অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে; ডাক্তারের নিষেধ আছে- তবুও তিনি কথা বলতে চান সবার সাথে। সবাইকে কাছে পেতে চান। সেই চাওয়া-পাওয়ার দাবী বেশীদিন থাকলো না। অবশেষে মায়ার বন্ধন ছিঁড়তে হলো তাঁকে। এক বছর পূর্বে আজকের এমনি একদিনে মাত্র ৫৪ বছর ৫ মাস বয়সে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত জনাব খানের জীবন দীপ নির্বাপিত হয়েছে।

ডক্টর শফিক আহমদ খান ছিলেন গতানুগতিক জীবনধারায় এক ব্যতিক্রম। ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী, বিনয়ী, নির্ভীক, নিরহঙ্কার, ধর্মভীরু উন্নত চরিত্রের ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, দেশ ও সমাজের কল্যাণ চিন্তা তাঁকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

শফিক আহমদ খানের ডাক নাম ছিলো মানিক মিয়া। স্বনামধন্য পিতা তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মরহুম মৌলভী কবীর উদ্দীন আহম্মদ খানের কর্মস্থল মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন বলেই তাঁকে মানিক বলে ডাকা হতো। নামে যেমন স্বভাবেও তিনি মানিক। দীর্ঘ সুঠামদেহী সুদর্শন চেহারার অধিকারী মানিক মিয়ার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সবাইকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখতো। মানিক মিয়া শৃঙ্খলিত জীবনযাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, ছেলেমেয়েদেরও পড়াতেন। ভোরে নিয়মিত কোরআন তেলওয়াত করতেন। এমনকি জীবনের শেষেরদিকে তাহাজ্জোদের নামাজও বাদ দিতেন না। স্বাধীনচেতা এই মহৎপ্রাণ ব্যক্তি, নীতি ও আদর্শে অটল থেকেই জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন। এক অকুতোভয় সৈনিক হিসেবে সমস্ত প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। অত্যন্ত মেধাবী, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই কৃতিমান পুরুষ নিজ সন্তানদের নিজের মতো করে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। সার্থক জীবন তাঁর। তাইতো মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তাঁর চেহারা এতটুকু ম্লান হয়নি। কোন দুঃখবোধ ও তাঁকে পারেনি বিচলিত করতে।

সিলেটে কর্মরত অবস্থায় জনাব খান ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। দেশে-বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। চিকিৎসকের পরামর্শ উপেক্ষা করে কর্তব্যনিষ্ট এই কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনে বনাঞ্চলের আনাচে-কানাচে ছুটে চলেন। শরীর ভেঙ্গে পড়ে, ক্রমে

অবসন্ন-ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অসুস্থতা বেড়ে যায় কিন্তু কর্মচাঞ্চল্যতা থেমে থাকে না। মৃত্যুর প্রায় ২ বছর পূর্বে চট্টগ্রাম বদলী হয়ে আসেন। বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছুটে আসেন সহকর্মীবৃন্দ। বিদায় জানাতে আরো আসেন স্থানীয় সরকারী-বেসরকারী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যাথায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বিদায় অনুষ্ঠানে আবেগের আতিশয্যে বক্তাদের বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অশ্রুসজল চোখে বিদায়ী বন্ধুকে জড়িয়ে ধরেন। বিদায় মুহূর্তে সহকর্মীদের ভীড়ে জনাব খানের গাড়ী এগুতে পারে না। অফিসের দারোয়ান-পিয়ন থেকে শুরু করে সহকর্মীদের সবাই একে একে তাঁর হাত চেপে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। শেষবারের মতো বিদায় জানাচ্ছেন। ভীড়ে কান্নার রোল উঠে। সত্যিই মানুষ মানুষকে কতইনা ভালোবাসতে পারে। ভালোবাসার প্রতিদান যথার্থই পেয়েছিলেন তিনি। কর্মক্ষেত্রে যেখানেই গেছেন ভালোবাসা দিয়ে এমনিভাবেই জয় করেছেন সহকর্মীদের মন।

বনবিভাগে তাঁর অসামান্য অবদান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুবিদিত। একজন সফল বন বিশারদ, নিবেদিত প্রাণ প্রথিতযশা গবেষক হিসেবে তিনি খ্যাতিমান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৬০ সালে জৈব-রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম, এস, সি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৩ সালে পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফরেষ্ট্রিতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ঐ বছরই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সিনিয়র ফরেস্ট সার্ভিসে সহকারী বন সংরক্ষক হিসেবে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে উপ-বন সংরক্ষক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৮২ সালে যুগোশ্লাভিয়ার সারাজেভো বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'সিল্‌ভিকালচার এন্ড ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট'-এ সম্মানসূচক ডি, এস, সি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে বন অধিদপ্তরে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত বন সংরক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন। জনাব খান পেশাগত প্রশিক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে বুলগেরিয়া, চেকোশ্লাভ, ইংল্যাণ্ড, ভারত, কেনিয়া, পাকিস্তান, পোল্যাণ্ড, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশসমূহ সফর করেন। ১৯৮৪ সালে শ্রীলংকার ক্যান্ডিতে IUERO (বন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক সমিতি) আয়োজিত কনফারেন্স, ১৯৮৫ সালে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে WINROCK-এর আন্তর্জাতিক কর্মশালা এবং IUFRO/IDRC- এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সেমিনার, ১৯৮৮ সালে কেনিয়ার নাইরোবীতে ICRAF (কৃষি-বন গবেষণাগার আন্তর্জাতিক কাউন্সিল) আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। সফলভাবে প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে IUFRO কর্তৃক 'সীড রেডিওগ্রাফীতে এবং ICRAF কর্তৃক 'অ্যাগ্রো-ফরেস্ট্রি'তে সনদপত্র লাভ করেন। IUFRO নিউ লেটার ও ICRAF নিউজ মিডিয়া অ্যাগ্রো-ফরেষ্ট্রি টু-ডে'-এর সদস্যপদ অর্জন করেন। এছাড়া 'যুগোশ্লাভলান্ট্যারি সোসাইটি অব ফরেস্টার্স'-এর আজীবন সদস্যপদ লাভ করেন। গবেষণা কাজে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য যুগোশ্লাভিয়ার সারাজেভো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'গোল্ড পিন' পদকে ভূষিত করে।

ডঃ শফিক আহমদ খান তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে বনবিভাগের উন্নয়ন কাজে লাগাতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। ফরেস্ট প্রশাসনে, ব্যবস্থাপনায়, বন আবাদ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে, বন গবেষণায় বিশেষ করে 'সিল্‌ভিকালচার এন্ড ফরেষ্ট ম্যানেজমেন্ট' রিসার্চে বনায়নের বিভিন্ন স্কীম বাস্তবায়নে গৌরবময় অবদান রেখেছেন। তিনি 'ম্যাংগ্রোভ ইকোসিস্টেম প্রজেক্ট'-এর আওতায় উপকূল বনায়নের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেন। বন সম্পদ সংরক্ষণ এবং বৃক্ষরোপন এলাকা সম্প্রসারণ কাজে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁর প্রচুর গবেষণামূলক নিবন্ধ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জার্নাল, পত্র-পত্রিকায় এবং বুকলেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাধর্মী পুস্তিকাও লিখেছেন তিনি। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রকাশিত তাঁর এইসব লেখা দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট সমাদৃত।

জনাব খান আজ আর বেঁচে নেই। তাঁর বিচিত্র কর্মময় জীবন আমাদের সাহস ও প্রেরণার উৎস। তিনি সেই মুষ্টিমেয়দের একজন যাঁরা আমাদের স্মৃতিতে সর্বদাই উপস্থিত। যাঁরা প্রতিদিনের মানসসঙ্গী, যাঁদের আমরা ভুলতে পারি না। অতিশয় অন্তরঙ্গজন মানিকমিয়া বেঁচে থাকবে সবার মাঝে, সবার হৃদয়ে।

⁂

SHAFIQUE KHAN AS I KNEW HIM

S. A. Imam
D. C. F. Dhaka

I joined Peshawar Forest Academy in 1960. Late Dr. Shafique Khan with five others from the East Pakistan joined the Academy in the year 1961. Very soon he became popular with his peers for his quality as a future officer of the service.

His charming personality and attitude to learn as much as he could was aguiding factor to the younger offices. He exerted most in all spheres of life. Sports is one of them particularly cricket & tennis. Khan loved good food too. He was punctual about physical training and athletics. The first item of physical training used to be three miles run in the early morning. He never grumbled particularly during winter and cut different types of jokes to make the situation light.

I left the cheerful company of S. A. khan behind in October 1962. The separation was felt. Khan came back after one year and joined his probationary period for five years.

S. A. Khan was posted as Divisional Forest Officer in Chittagong hill tracts in the year of 1972. He proved himself as a successful Divisional Forest Officer there and was very popular among the district officers. We gave friendly visits to each othter once in a while.

I got Khan back as our neighbor in 1984 when he was Divisional Forest Officer Silviculutre in Forest Research Institute of Chittagong. This neighbourhood ship lasted for three years. Here we found the only D. Sc. in Forestry of the Department. He turned out to be a very good teacher. He Conducted any meeting very lucidly.

Dr. Khan was not only a devoted Govt. servant but also a very loving father and husband. He used to celebrate the birth days of his children and his marriage anniversaries on date. Even in his death bed Khan did not forget his marriage anniversary. His clarion call to his children showed the amount of love and affection he had for them.

All of his brothers or sisters used to come to Khan whenever they needed his wise suggestions. khan never faltered. He appreciably justified the performance of his duties towards them

Ghunati.com
Pioneer in village based website

and to his parents. His father preferred to spend the rest of his life with Khan despite having eleven other children. He expired at khan's house at the age of 82.

Shafique Khan loved out doors. He used to go out to different research stations, natural forest and places where various birds could be seen. At times he was accompanied by his family and friends.

He participated actively in day to day works of the family. we can not forget the scene of Dr. Khan going to bazar wearing a gumboot during rains.

It would not depict Dr. Khan completely unless itis said that he was very particular about saying prayers five time a day. Normally we used to have a walk from our house down hill after 'Asar' prayers. Some times seating in his backyards we would take tea dnd have chats mostly funny. He had the capability of conducting discussion with all age groups. He may be said as "Man of all seasons."

Very good people do not live long. Dr. Khan is an example to this point. Allah in his infinite mercy has taken him at the age of fifty two. His untimely death is an irrepairable loss to us and it is very difficult to forget his companionship.

hunati.com
Pioneer in village based website

ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা

শাহনূর আহমেদ খান (রনী)
সিলেট ক্যাডেট কলেজ

প্রত্যেক বাবা মার কাছে সন্তান যেমন অতি আদরের ধন, তেমনি সন্তানের কাছেও বাবা-মা পরম শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার। তাই নিজের বাবা-মার কথা লিখতে গেলে বিশেষত বাবা যদি মৃত হন, তবে সে লেখা আবেগ নির্ভর, অতিরঞ্জিত এবং যুক্তি বহির্ভূত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু ডায়েরী হচ্ছে - কোন ব্যক্তির মন-মানষিকতার সরাসরি প্রতিফলন। ঐ ব্যক্তি যা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, যা তার একান্ত গোপন ভাবনা, তাই সে ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে। আমি খুব ছোট বেলা থেকে নিয়মিত ডায়েরী লিখে থাকি। আমার বাবা সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারা, আমার বিশ্বাস, আমার সাথে ওনার সম্পর্ক আশাকরি এর মাধ্যমে পরিস্কার হবে।

নিচে সেই সব ডায়েরীরই কিছু কথা তুলে দিচ্ছি ঃ

১৯৮১ সাল, তারিখ............

. . . . আব্বু বিদেশ থেকে Cassate পাঠিয়েছে। একটি Cassate এ শুধুমাত্র আমার জন্য গল্প বলেছে। কিংলিয়ারের গল্প, বেচারা রাজা! আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করত, আমি অবশ্য বলতাম - আমি আমার আব্বুকে পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশী ভালোবাসি, এমনকি নুনের চেয়েও।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

১৯৮২ সাল, তারিখ............

. . . . আজ ঈদ। আব্বু ছাড়া ঈদ ভালো লাগছেনা, সবারই আব্বু আছে। সাগর, সজলের আব্বু কত আদর করছে ওদের। আর আমাদের আব্বুই শুধু বাইরে। কি দরকার এত পড়াশুনার?

১৯৮২ সাল তারিখ.............

. . . . আজ আমার জন্মদিন। আব্বু আমার জন্য- কার্ড, Lego-set, আর একটা জ্যাকেট পাঠিয়েছে। দোলার জন্মদিনে শুধু কার্ড পাঠিয়েছিল। আসলে আব্বু দোলার চেয়ে আমাকে অনেক বেশী ভালোবাসে।

১৯৮৩ সাল, তারিখ............

. . . . আব্বু আসছে আজ। কতদিন পরে দেখা হবে! সবাই Airport এ দাঁড়িয়ে আছি। অনেকক্ষণ পর একজন Sunglass পরা, টাকমাথা লোক হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে আমাকে কোলে নিল। বলল- "আমাকে চিনতে পারছোনা, রনী বাচ্চা? আমি তোমার আব্বু।" আমি প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম- কক্ষনো না, আমার আব্বুর কত চুল ছিলো . . . . . . ।

১৯৮৩ সাল, তারিখ.............

. . . . আব্বু এত মজার মজার গল্প জানেন। আসার পর থেকে শুধু গল্পই করছেন। বিদেশের ভ্রমণের গল্প, রূপকথার গল্প আরও কতকি! আমার জন্য অনেক কিছু এনেছে। অনেক দিন পর আব্বুকে পেয়ে কি যে ভালো লাগছে। আব্বু বলেছে- এখন থেকে আমাদের ছেড়ে আর কোন দিন বিদেশে যাবেনা।

১৯৮৪ সাল, তারিখ.............

. . . . আমাদের বাসায় আজ মিলাদ পড়ানো হলো। এটা নতুন কিছু নয়। মিলাদ, নববর্ষ, ঈদ ইত্যাদির উৎসব লেগেই আছে। আমার মনে হয় এগুলো উপলক্ষ মাত্র। আব্বু আসলে সব সময় জাঁকজমক, হৈ চৈ, আনন্দফূর্তি পছন্দ করেন। সুযোগ পেলেই আত্মীয় স্বজনদের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসেন।

১৯৮৪ সাল, তারিখ.............

. . . . আমাদের Final পরীক্ষার Result দিয়েছে। আমি 14th হয়েছি। অংকে পেয়েছি মাত্র ৭৪ (চুয়াত্তর)। আব্বু শুধু বলল - "I am not happy." আর কখনো দুষ্টুমি করবোনা। এখন থেকে ঠিক মতো পড়াশুনা করব, আব্বুকে যেন খুশী করতে পারি।

১৯৮৫ সাল, তারিখ.............

. . . . আব্বু একটাও রোযা রাখতে দেয় নাই। বলে আমার নাকি কষ্ট হবে। আমি এখন বড় হয়েছি না? মেঝ ভাইয়াতো ঠিকই রোযা রাখছে। আব্বুর তো জ্বর, জ্বর নিয়েও উনি রোযা রাখতে পারলে আমি কেন পারবোনা?

১৯৮৫ সাল, তারিখ.............

. . . . আজ ঈদ। আব্বুসহ আমরা সবাই একই রকম পাঞ্জাবী পরেছি। সকালে নামাজ পড়ে, আব্বুকে সালাম করতেই পাঁচ টাকা দিল-ঈদি। প্রতি ঈদেই পাঁচ টাকা আমাদের সবার জন্য বরাদ্দ ছিল।

১৯৮৫ সাল, তারিখ.............

. . . . সবাই আজ শিকারে গেছে। আমাকে নেয় নাই পাহাড়ে নাকি কষ্ট হবে। অনেক হাঁটতে হবে। আমিতো হাঁটতে পারিই। আব্বু শুধু শুধু চিন্তা করে আমার জন্য।

১৯৮৫ সাল, তারিখ.............

. . . . আমার খুব জ্বর হয়েছে। ডাক্তার নূরুল হুদা বলেছে-বৃষ্টিতে ভিজার জন্য। আব্বু অবশ্য কিছু বল্লোনা, আম্মু খুব বকা দিচ্ছিল। উল্টো আম্মুকে বলল- "আহা! এই বয়সটাতো বৃষ্টিতেই ভিজবার।" তারপর নিজের হাতে আমার কপালে জলপট্টি দিল।

১৯৮৬ সাল, তারিখ.............

. . . . ওরে আল্লাহ! আব্বু ছোট বেলায় এত দুষ্টু ছিল! সারাদিন নাকি গুল্‌তি নিয়ে ঘুরতো। হাযামের মাথায় নাকি ইটও মেরেছিল। তাই দাদা ঘোড়ার চাবুক দিয়ে আব্বুকে মেরেছিল। আজ সারাদিন আব্বুর ছোটবেলার গল্প শুনলাম।

১৯৮৬ সাল, তারিখ................

. . . . আব্বু খুব রাগ করেছে আমার উপর। পাশের বাসার জানালার কাঁচ গুল্তি মেরে ভেঙ্গে দিয়েছি। আব্বু কখনোই বকাবকি করেনা। শুধু বলল - "What is this". কখনো মারতোনা বা বকা দিতোনা বলেই সামান্য এই কথা কটি অনেক বেশী হয়ে বাজল মনে।

১৯৮৭ সাল, তারিখ................

. . . . দাদা মারা গেলেন। আব্বু খুব কাঁদছে। আব্বুকে কখনো ভেঙ্গে পড়তে দেখেনি। চরম বিপদের সময়ও তিনি হাসিখুশি থাকেন। সব মানুষের জীবনে 'বাবা' কতটুকু জায়গা জুড়ে থাকে, আব্বুকে দেখে আজ কিছুটা অনুভব করলাম।

১৯৮৭ সাল, তারিখ................

. . . . আমরা, খালারা, মামীরা সবাই মিলে রাঙামাটি গেলাম। খুব মজা করলাম। আব্বু আমাদের চাক্মা রাজার বাড়ীতে নিয়ে গেল। স্পিডবোটে করে ঘুরলাম।

১৯৮৮ সাল, তারিখ................

. . . . আমরা পুরো সিলেটে একটা বিরাট ট্রিপ দিলাম। প্রথমে গেলাম হরিপুর হয়ে জাফলং। তারপর সিলেট থেকে Speed Boat এ সুনামগঞ্জ। সেখানে S.P.P.M. দেখলাম। এরপর মৌলভী বাজার, শ্রীমঙ্গল, লাউয়্যাছড়া, সাতছড়ি, মাধবকুণ্ড, পুঁটিছড়া, কালেঙ্গা, জুরি, হবিগঞ্জ ইত্যাদি। আব্বুর Jurisdiction যে এত বড় তা জানতাম না।

১৯৮৮ সাল, তারিখ................

. . . . শাফায়েত চাচা মারা গেছেন। চিন্তা করতেও কেমন লাগছে। হাসিখুশী মানুষটা। আব্বু কাল ঢাকা থেকে এসে অবধি কাঁদছে। রক্ত সম্পর্কহীন একজন Junior Collegue এর জন্য কারও এত টান থাকতে পারে চিন্তাও করিনি।

১৯৮৯ সাল, তারিখ................

. . . . আমাদের বাসায় আজ বিরাট Party হচ্ছে। সিলেটের প্রায় সব এলিটরাই এসেছেন। আব্বু সবার মাঝখানে বসে এক একটা Joke বলছেন- আর সবাই হাসিতে ফেটে পড়ছে। সব আসরেই দেখা যায় আব্বুই মধ্যমনি।

১৯৮৯ সাল, তারিখ................

. . . . হঠাৎ করে আম্মুসহ আব্বু চেক আপ করাতে Bangkok গেলেন। আল্লাহ্ ওঁদের সুস্থ রাখুন।

১৯৮৯ সাল, তারিখ................

. . . . কাল আমি Cadet Collage এ জয়েন করব। আম্মু Bangkok থেকে ফোন করে খুব কান্নাকাটি করেছে। আব্বু এই সময় কাছে থাকতে না পারায় দুঃখ করলো। উল্টো আমি ওদের সান্ত্বনা দিলাম। আব্বু ফোনে অনেক দোয়া করল আমার জন্য।

১৯৮৯ সাল, তারিখ.................

. . . . . আব্বুরা দেশে ফিরেই আমার সাথে দেখা করতে গেছে। যদিও Parent'sday না, তবুও Special Permission এ। আব্বুর চেহারায় অসুস্থতার ছাপ পুরো মাত্রায়। চুল সব পেকে গেছে। অজানা আশংকায় বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠলো। আমার জন্য কত কিছু নিয়ে এসেছে। যতই বোঝাই Cadet Collage এ এগুলো নেওয়া সম্ভব না। কিছুতেই বুঝতে চায়না-বলে, লুকিয়ে রেখে দিও।

১৯৮৯ সাল, তারিখ.................

. . . . আজ Collage ছুটি হলো। আব্বুরা গাড়ি নিয়ে নিতে এসেছে। আজ অনেকটা সুস্থ লাগছে আব্বুকে। বাড়িতে আসার পর থেকেই কি খাবো, কোথায় বেড়াতে যাবো, কি লাগবে ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে করে অস্থির হচ্ছেন।

আজ ক'দিন থেকে আব্বুর কাছে ইংরেজী পড়ছি। আব্বুর কাছে পড়াটা আমার কাছে ভীষণ আনন্দের। এত সুন্দর করে, সহজ করে আজ ইতিহাস পড়ালেন।

১৯৯০ সাল, তারিখ.................

. . . . আব্বু সিলেট থেকে চিটাগাং বদলী হলো। আমার সাথে যখন তখন দেখা করতে না পারলেও ভরসা ছিল-কাছেই তো আছে সবাই। এখন একেবারে চিটাগাং। অবশ্য আমি স্বার্থপরের মত চিন্তা করছি। আব্বুর জন্য এই বদলিটা জরুরী ছিল। এখন কিছুটা হলেও Rest নিতে পারবে।

hunati.com
Pioneer in village based website

১৯৯০ সাল, তারিখ.................

. . . . আব্বুর চিঠি পেলাম। কি সুন্দর ইংরেজী। আর এত Methodical মানুষ-কি কি কাজ করলো সেটা আবার ১/২ করে মার্কিং করেছে। এখন নাকি আগের চেয়ে ভাল। ভাল থাকলেই ভাল। আমি সব সময় তার আরোগ্য কামনা করি।

১৯৯১ সাল, তারিখ.................

. . . . সারা দেশে ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেল। বিশেষতঃ চিটাগাং নাকি একেবারে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। আব্বুরা কেমন আছে কে জানে! পাহাড়ের উপর আমাদের ছবির মত সাজানো বাংলো, বাগান কতটা বিধ্বস্ত হয়েছে আল্লাহ্ই জানেন!

১৯৯১ সাল, তারিখ.................

. . . . আব্বু আম্মু আবার Bangkok গেল। আব্বুর অসুখটা ভাল হচ্ছে না কেন? পৃথিবীতে এত খারাপ লোকেরা দিব্যি আছে। তাদের কিছু হয় না; আর আব্বুরই বেছে বেছে একটা কঠিন অসুখ হবার কি দরকার ছিল?

১৯৯১ সাল, তারিখ.................

. . . . রোজা চলছে। আমি প্রতিদিন রোজা রাখছি। সব সময় নামাজ পড়ে দোয়া করছি। "হে আল্লাহ আমার রোজার সমস্ত সওয়াব এবং নামাজের সওয়াবের বিনিময়ে আমার আব্বুকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দাও।"

১৯৯১ সাল, তারিখ.................

. . . . আব্বুরা ফিরলেন। খুব খুশী লাগছে আব্বুকে দেখে। একেবারে আগের মত সুঠাম, সুন্দর। আব্বুর খাওয়া দাওয়া পূর্ণ Restriction. তবে তিনি কি আর Restriction মানেন। মাঝে মধ্যে এমন বাচ্চাদের মত করেন, খুব মায়া হয়। আহা! বেচারা কত ভোজন বিলাসী ছিলেন!

১৯৯২ সাল, তারিখ.................

. . . . Principal Sir হঠাৎ ডেকে বল্লেন 'তোমার আব্বু একটু অসুস্থ, ছুটিতে বাড়ি যাও।' মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো। বলে কি? হঠাৎ এমন কি অসুস্থ হলো যে ছুটিতে যেতে হবে? পরে চিন্তা করলাম নিশ্চয়ই কোন অনুষ্ঠান আছে, ছুটি পাওয়া যাচ্ছে না বলে অসুখের কথা বলেছে।

আসলে অনেককেই হাসপাতালে ভর্তি হতে দেখি। কিন্তু নিজের বাবাও যে কখনও হাসপাতালে যেতে পারেন, তা ভাবতে পারিনি। D.F.O. চাচার বাসা থেকে ফোনে কথা বলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। সামান্য দাঁত তোলা থেকে কি কান্ড!! চিটাগাং পৌছেই হাসপাতালে (হলি ক্রিসেন্ট) গেলাম। আব্বু বেশ হাসি খুশী আছেন। কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগছে। খালা, মামীরা ইশারায় কথা বলছেন। আমার মনে হচ্ছে ওনারা কিছু একটা লুকাচ্ছেন। কিন্তু সেটা কি? আব্বুতো দেখি বেশ ভালই আছেন। প্রশ্ন করেও কারো কাজ থেকে সঠিক জবাব পাইনি।

যে ক'দিন ছিলাম, সারাদিন হাসপাতালে থাকতাম। আমার সাথে অনেক গল্প করেছেন। ভাল হয়েই একটা বড় ধরনের ট্যুর Programe করবেন। এবার আমাদের সবাইকে নিয়ে St.Martin দ্বীপ দেখাবেন। আব্বুকে বাসায় নিয়ে আসা হলো। শুভ গৃহ প্রত্যাবর্তন অনুষ্ঠান করলাম আমরা।

১৯৯২ সাল, তারিখ.................

. . . . আব্বু নাকি আবার অসুস্থ হয়ে গেছেন। আবার ছুটিতে গেলাম। হাসপাতালে পৌছে দেখি লোকে লোকারন্য। সবার মুখেই দিশেহারা ভাব। আশংকার ছায়া। এই প্রথম আমি ভয় পেলাম। একটা অজানা শঙ্কায় মনটা ভার হয়ে গেল। এতদিন তেমন একটা Care করি নাই। আর্জ কিছুটা অনুভব করতে পারলাম।

আমি যেতেই রনি এসেছে, রনি এসেছে বলে শোরগোল পড়ে গেল। কি ব্যাপার। আমি এত বিখ্যাত হলাম কবে? পরে শুনলাম আজ সকাল থেকে আব্বুর অবস্থা নাকি প্রচন্ড খারাপ ছিল। ডাক্তাররা নাকি No hope বলে দিয়েছেন। সব আত্মীয় স্বজন দেখা করে মাফ চেয়ে নিয়েছেন। উনিও সবাইকে যা বলার বলেছেন। কেবল আমি বাকী ছিলাম। আমার কথা নাকি বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন সবাইকে। Cabin এ ঢুকলাম। কেমন যেন ভয় লাগা পরিবেশ। চারিদিকে লোকজন কোরান শরীফ পড়ছে। আব্বুর চোখ জবা ফুলের মত লাল। জড়ানো অথচ আবেগ ভরা গলায় বল্লো- ''তুমি এসেছো রনি বাচ্চা? তোমার জন্যই আব্বু অপেক্ষা করে আছি। খুব ভাল করে পড়াশুনা করবে।

তোমার উপর আমার অনেক আশা। আম্মুর দিকে খেয়াল রাখবে। এটাই আমার আদেশ।" একটানা কথাগুলি বলে হয়রান হয়ে গেলেন।

কাঁপা কাঁপা হাতে আমার মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। আদর করলো অনেকক্ষণ। হত বিহবল দৃষ্টিতে দেখলাম মৃত্যুপথযাত্রী আমার প্রাণপ্রিয় আব্বুকে। অনুভূতি কেমন যেন ভোতা হয়ে গেল।

পরবর্তী আর কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। খালা আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন। ঘুমের ঔষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

১৯৯২ সাল, তারিখ................

. . . . পরদিন আব্বুকে দেখে বিরাট স্বস্তি পেলাম মনে। আজ তিনি সম্পূর্ণ ভাল। ডাক্তাররা 'থ'। গতকাল এবং আজকের মধ্যে যোজন তফাৎ। ডাক্তাররা যেখানে আশা ছেড়ে দিয়েছেন, রাতটুকু পার হবে কিনা সন্দেহ ছিল তাঁদের। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। এর মধ্যে আব্বু ওনাদের ম্যারেজ এ্যনিভারসারী পালন করার জন্য জোর করতে লাগলেন। রুমে যে ডাক্তার, নার্স আসছিল সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। আম্মুর মানসিক অবস্থা এতটাই বিদ্ধস্ত ছিল-তিনি এ ব্যাপারে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না।

১৯৯২ সাল, তারিখ................

. . . . আব্বুর একটা পাশ অবশ, চোখ টকটকে লাল, আর সারা শরীরে অসংখ্য সুঁচ, রক্ত, স্যালাইন চলছে অনবরত। যতই দেখছি বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠছে। সেই চিরাচরিত প্রানবন্ত হাসি লেগে আছে মুখে। এত কষ্টের মাঝেও যে হাসতে পারে তিনি আমার অনন্য অসাধারণ বাবা। তাঁর তুলনা তিনি নিজে। মাথার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখ্ছিলাম তাঁকে! চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল বাবা, তোমাকে বাঁচতে হবে আরো অনেক দিন। আমাদের জন্য, মার জন্য, সবার জন্য। আজকের দিনের জন্য আম্মুকে আব্বুকে দেবার কি আছে আমার? প্রাণের সবটুকু ভালবাসা, শ্রদ্ধা! সেতো চিরকালের জন্য আছে। ঘর ভরা লোক। আজ সবার অলখ্যে মোনাজাত করলাম "আল্লাহ, তুমি আমার আব্বুকে হায়াত দরাজ কর।"

অনেকে এসেছেন। বই, কার্ড আর অসংখ্য ফুলের তোড়ায় ভরে গেছে ঘরটা। আব্বু প্রতিবারের মতই আম্মুর জন্যও আনিয়েছেন বিশাল এক ফুলের সাজি। আজ ওঁদের বিবাহ বার্ষিকী।

১৯৯২ সাল, তারিখ................

. . . . ৫ দিন চিটাগাং থেকে চলে এসেছি সিলেট। মনটা পড়ে আছে হাসপাতালে। আম্মুর জন্য চিন্তা হচ্ছে। কখন কি ঘটে যাবে এই আশংকায় কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারছিনা।

১৯৯২ সাল, ৫ই জুন ....

. . . . 2nd Term পরীক্ষা শেষ হয়েছে। নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছি। মিজান স্যার এসে বল্লেন- ৩ দিন পরতো তোমাদের ছুটি। কি দরকার এই দুটা দিন কলেজে থাকার? তার চেয়ে ছুটিতে চলে যাও। অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা বার্তা। সন্দেহের কারণ নাই। পর

পর দু'বার ছুটিতে যাবার ফলে আশঙ্কাও কমে গেছে। হান্নান চাচা গাড়ি ভাড়া করে দিলেন। সংগে লোক ছিলো। ওনাদের আচরণ কেমন যেন অসংলগ্ন। রাত ৯ টায় কুমিল্লায় জুনায়েদ চাচার বাসায় পৌছালাম। সবার ব্যবহার খাপ ছাড়া লাগছে। পরে কারণটা বুঝেছিলাম -------। সারাটা পথ অজানা আশংকায় দূরু দূরু করছিল বুকের ভেতরটা। তবুও খারাপ চিন্তাগুলো জোর করে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলাম।

রাত আড়াই টায় বাসার কাছে আসতেই কেমন যেন শীত শীত লেগে উঠলো। চারিদিকে আতর গোলাপের তীব্র গন্ধ। গাড়ি থেকে নেমে দেখলাম অস্বাভাবিক এক শূন্যতা চারিদিকে। ড্রইং রুম খালি। নিমেষে যা বুঝবার বুঝে নিলাম। অনুভূতি শূন্য হয়ে গেলাম। আসলে যা মহাসত্য এবং অবধারিত তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। বাসায় ছিল শুধু অপু ভাই। আমি শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলাম ---- কখন?

১৯৯২ সাল, ৬ই জুন ....

আমি এত পাষাণ কেন! একফোটা চোখের পানি বের হচ্ছে না। আসলে আমার বিশ্বাসই হচ্ছেনা পুরো ব্যাপারটা। মনে হচ্ছে আব্বু কোথাও ট্যুরে গেছেন, আবার চলে আসবে। আহা! আমি শেষ দেখাটুকুও দেখতে পারলাম না। দাফন কাল সন্ধ্যায় হয়ে গেছে। Paper এ আব্বুর ছবিটা কেমন অপরিচিত মনে হলো। আম্মুরা চলে এসেছেন। সবাই কাঁদছে! আমি কাঁদতে পারছিনা কেন? কেন? কেন?

১৯৯২ সাল, তারিখ ....

. . . . আব্বু ছাড়া ঈদ করছি। সমস্ত আত্মীয় স্বজন একসাথে ঈদ করছে। আজ আব্বু থাকলে সব চেয়ে বেশী আনন্দ পেতেন। সব কিছুই আজ ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে .... ভোর ৫ টায় কেউ গোসলের জন্য তাড়া দিলো না। ঘর থেকে বের হবার সময় কেউ আতর দিয়ে দিলো না। সালাম করতেই কেউ ৫ টাকা ঈদি দিলো না। এটা আসলে লোক দেখানো ঈদ হচ্ছে। একটি মানুষের অনুপস্থিতি হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিকে ম্লান করে দিয়েছে। যার ক্ষতি হয় সে-ই বুঝে।

১৯৯৩ সাল, ১৮ই এপ্রিল................

. . . . কাল থেকে S.S.C. পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। আমাকে ভালো Result করতেই হবে। আব্বুর শেষ আদেশ ছিল ভালভাবে পড়াশুনা করার। আমি এটা যে ভাবে হোক রক্ষা করবো, আল্লাহ্ তুমি আমার সহায়।

১৯৯৩ সাল, ৩১ জুলাই...............

. . . . আজ Result বের হোল। আল্লাহ্‌র কি অশেষ রহমত, আমি সমাজ বিজ্ঞানে Comilla Board থেকে 1st Stand করেছি। তবে তেমন আনন্দ হচ্ছে না। যিনি থাকলে সবচেয়ে বেশী আনন্দ করতেন তিনিই নেই।

সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলো.. আপনার অনুভূতি কি? আমি বল্লাম- আজ এই খুশীর দিনে আব্বুর অভাব খুব বেশী অনুভব করছি--------।

নাইরোবীতে ডঃ শফিক আহমদ খান

আফজালুর রহমান
উর্দ্ধতন গবেষণা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট
চট্টগ্রাম।

১৯৮৮ সালে নাইরোবীতে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন এগ্রোফরেষ্টিতে (ইকরাফ), এগ্রোফরেষ্টির উপর উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ থেকে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তায় চারজন বিজ্ঞানী নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। বাকী তিনজন ছিলেনঃ বনবিভাগ থেকে ডঃ শফিক আহমদ খান ও ডঃ জাকির হোসেন এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট থেকে ডঃ জয়নুল আবেদীন। সে সময় ডঃ খান সিলেট বনবিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হিসাবে কর্তব্যরত ছিলেন।

'ইকরাফ' বিভিন্ন উন্নত দেশের যৌথ সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে এগ্রোফরেষ্ট্রি এখন একটি সর্বোৎকৃষ্ট ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এগ্রোফরেষ্ট্রির বিভিন্ন শাখা প্রশাখার উপর মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্বে 'ইকরাফ' শীর্ষস্থানে রয়েছে। পৃথিবী ব্যাপী এগ্রোফরেষ্ট্রি গবেষণালব্ধ তথ্যসম্ভারের উপর ভিত্তি করে 'ইকরাফ' খুবই ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে এবং প্রতিবছর প্রশিক্ষণ দান করে থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে যে সব বিজ্ঞানীরা এগ্রোফরেষ্ট্রি গবেষনা ও উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তাঁদের মধ্য থেকেই নির্দ্ধারিত সংখ্যক বিজ্ঞানীকে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে উপযুক্ত প্রার্থী হিসাবে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করা হয়। ১৯৮৮ সালে ৩১টি দেশ থেকে ৪০ জন মনোনীত প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নাইরোবীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রশিক্ষণ ছাড়াও এ সমাবেশের আর একটি বিশেষ দিক হল এই যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা এখানে পরস্পর মত বিনিময়ের চমৎকার সুযোগ লাভ করেন। আমরা হোটেল 'সিক্স-এইটিতে' অবস্থান করতাম। এ হোটেলটি নাইরোবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

নাইরোবীতে সমবেত অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা ছিলেন বয়সের দিক থেকে ডঃ শফিক খান সাহেবের চেয়ে তরুন। এ সব তরুন বিজ্ঞানীদের সাথে ডঃ খান প্রতিষ্ঠিত করতে পেয়েছিলেন একটি চমৎকার বন্ধুত্ব। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন সর্বাধিক জনপ্রিয়তা। তাঁর বন্ধুত্বের মধ্যে যেমনি ছিল সারল্য তেমনি ছিল অপূর্ব প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের চমক। খাওয়ার টেবিলেই হোক, চা-চক্রেই হোক, যেখানেই তিনি থাকতেন সেখানেই জড়ো হয়ে তাঁকে ঘিরে ধরতো সবাই। সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতো তাঁর হাস্যোজ্বল মুখ থেকে উন্নত ভাষায় সুকৌশলে উপস্থাপিত

কৌতুকসমূহের গভীরতায়। মাঝে মাঝে সবাই হেঁসে ফেটে পড়তেন, আবার মাঝে মাঝে হয়ে যেতেন বিস্ময়ে হতবাক। এরই ফাঁকে ফাঁকে তিনি আলোকপাত করতেন প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর বিচক্ষণ ও রসালো মন্তব্যসমূহ। অনেকেই তাঁর কাছ থেকে প্রশিক্ষণের জটিল বিষয়সমূহ বুঝে নিতেন। কেনিয়ার গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণের প্রতিক্রিয়া তিনি ব্যক্ত করতেন তাঁর অন্যান্য দেশ ভ্রমণের ব্যাপক অভিজ্ঞতার অনুপম মিশ্রণে। খুবই জ্ঞানগর্ভ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো এসব আলোচনা। প্রশিক্ষণের ব্যাপারসমূহ তিনি চা খেতে খেতে আরো তত্ত্ববহুল করে ফুটিয়ে তুলতেন।

আমাদের প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিল কাজের কঠোর চাপ। সারাদিন ক্লাশ- ফাঁক নেই। ঘন ঘন যেতে হত 'ইকরাফের' গবেষণা কেন্দ্রসমূহে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য। সপ্তাহান্তে যেতে হত দূরবর্তী গ্রামীণ এলাকায় ডি এন্ড ডি জরীপ ও অনুশীলনের কাজে। এ জন্য সমস্ত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছিল। ডঃ খান ছিলেন আমাদের গ্রুপের গ্রুপ লিডার। তিনি গ্রুপ লিডার থাকাতে, প্রশিক্ষণার্থী বিজ্ঞানীরা কাজের গুরুভারও সম্ভবত মানসিক যাতনা থেকেও যেন কিছুটা নিস্তার পেতেন, স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলতেন। সফরসমূহকে তিনি বিজ্ঞানীদের কাছে উপভোগ্য করে তুলেছিলেন। নিষ্ঠার সাথে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। কেনিয়ার প্রত্যন্ত পাহাড়িয়া গ্রামীণ এলাকায় জরীপ কাজের ক্লান্তিকর পরিস্থিতিতে ডঃ খানের ভুমিকা ছিল সত্যিই অনন্য। প্রশিক্ষণার্থীদের মনকে আশায় ও উৎসাহে ভরে তুলতেন তিনি। বিশেষ করে মোম্বাসা ও মেছাকদ সফরকালে তাঁর ভূমিকার কথা কেউ কোনদিন ভুলতে পারবেনা।

প্রশিক্ষণের প্রায় শেষ দিকে ডি এন্ড ডি অনুশীলনের কাজ হাতে কলমে পরিপূর্ণভাবে মাঠ পর্যায়ে সমাধা করার জন্য সমস্ত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দু'গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল। এক গ্রুপকে পাঠানো হয়েছিল এম্‌বুতে। এম্‌বু একটি দূরবর্তী পাহাড়িয়া অঞ্চল। এখানে 'ইকরাফ' বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে কয়েকদিন ব্যাপকভাবে 'ডি এন্ড ডি'র কাজ চালানো হয়। রাতে থাকতে হত খোলা আকাশের নিচে তিনজন করে এক একটা তাবুতে। সাপ ও বন্যজন্তুর ভয় ছিল খুব বেশী। এ ভয়বিহ্বল অবস্থায় ডঃ খান ছিলেন ভরসা। তিনি যেন সবাইর কাজের চাপ বহুলাংশে কমিয়ে দিয়েছিলেন। সবাইর মুখে ফুটিয়ে রেখেছিলেন হাসি। এম্‌বু ট্রিপে ডঃ খান না থাকলে হয়তো কাজটা পরিপূর্ণভাবে সমাধা করা হয়ে উঠতো না। এম্‌বু থেকে পাওয়া উপাত্তের উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট তৈরি ও উপস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আমাদের গ্রুপকে। এবারেও ডঃ শফিক খান সাহেবের উপর ভরসা করে সবাই স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি আমাদের কয়েকজনের সহায়তায় একটি অপূর্ব রিপোর্ট তৈরি করেন ও তা উপস্থাপন করেন। বলাবাহুল্য, উপস্থাপক হিসাবে ডঃ খান ছিলেন সর্বদা অনন্য। তাঁর উপস্থাপনার কলাকৌশল, গভীরতা ও স্বতঃস্ফুর্ততায় মুগ্ধ হয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রশিক্ষণার্থী বিজ্ঞানীরা, এমনকি 'ইকরাফ' বিশেষজ্ঞগণ। সেবার আমাদের গ্রুপ প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল।

ডঃ শফিক খান ছিলেন ভিতরে ভিতরে খুবই ধার্মিক। নাইরোবীতে হোটেলকক্ষেও তিনি নামায ছাড়েননি। শুক্রবারে তিনি বহুদূরে মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে যেতেন। কোন সময় কোন অনুষ্ঠানে তাঁকে মদ্যপান করতে দেখা যায়নি।

একদিন ভোরে তিনি পাঞ্জাবী গায়ে হোটেল পার্লারে এসে সবাইর সাথে করমর্দন আরম্ভ করলেন আর বলতে থাকলেন 'ঈদ মোবারক'। কারো খেয়ালই ছিলনা যে সে দিন ছিল ঈদের দিন। তিনিই ঈদের খবর দিলেন সবাইকে। আনন্দে ভরিয়ে তুললেন পরিবেশটাকে। এ সময় তিনি স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থেকে দূরে থাকার জন্য দারুন আফসোস করেছিলেন। পরিবারের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ সেবার অনুভব করতে পেরেছিলাম।

'ইকরাফ' প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এ'জন্য এক একটি মহাদেশ থেকে এক একজন গ্রুপলিডার নির্বাচন করা হয়। গ্রুপলিডার নিজস্ব মহাদেশের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিক্রিয়া আলোচনার মাধ্যমে অবহিত হন এবং বিদায়ী অনুষ্ঠানে তা ব্যক্ত করেন। এটা গর্বের ব্যাপার যে ডঃ শফিক খান এবারেও এশিয়া মহাদেশের জন্য গ্রুপলিডার নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্য সুনিপুণভাবে ও প্রগাঢ় পান্ডিত্যের সাথে তুলে ধরেন। ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণের উন্নয়নের জন্য তিনি বহু মূল্যবান সুপারিশ রেখেছিলেন।

ডঃ খানের হৃদয় ছিল বন্ধুবৎসল ও সহানুভূতিশীল। বিদেশী প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁকে দেখলে খুশীতে ভরপুর হয়ে উঠতেন এবং তাঁকে বিভিন্ন সমস্যার কথা বলতেন। ডঃ খান চমৎকারভাবে এসব সমস্যার সুরাহা করে ফেলতেন।

১৯৮৮ সালে 'ইকরাফে' বিভিন্ন দেশ থেকে যে সব প্রশিক্ষণার্থী বিজ্ঞানীরা উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা ডঃ খানের অকালে অকস্মাৎ চিরবিদায়ের কথা শুনে থাকলে নির্ঘাত করুন আর্তনাদে লুটিয়ে পড়বেন।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

অতি চেনা 'মানিকদা'

নাজমা মুস্তাফা

ডঃ শফিক আহমদ খান সাহেবকে অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবে চিনবার সুযোগ হয়েছে বলে আজকে তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখার একটা তাগিদ অনুভব করছি।

কেবলমাত্র পারিবারিক সূত্রেই নয় তারও বহু আগে থেকেই আমাদের সংগে খান সাহেব একটা যোগসূত্র করে নিয়েছিলেন তাঁর অমায়িক ব্যবহার দিয়ে। আমার বাবা এবং খান সাহেবের বাবার বন্ধুত্ব ছিল বাইশ বছরের। এই ভাবেই এই পরিবারের সংগে আমাদের পরিবারের একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। খান সাহেব আমাদের মানিকদা অর্থাৎ আরও একজন সম্মানিত বড় ভাই হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা যারা ছোট ছিলাম, সবাই মানিকদার ভীষণ ভক্ত ছিলাম, কারণ অবসর সময়ে আমাদের বাসায় এলেই গানের/গল্পের আসর বসতো আমাদের বাড়ীর ছাদে। এতো চমৎকার সব হাসির গল্প বলতেন-আসরের ছেলে বুড়ো সবারই হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেত। অবাক হয়ে ভাবতাম, রোজ রোজ এত নিত্য নূতন গল্প পান কোথা থেকে? মা বলতেন-"ওর মনটাই যে রসের ভান্ডার"। উপস্থাপনার গুণে সেটা হোত আরও রসোত্তীর্ণ। মানিকদা চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেত গানে গানে। একটা গান আমার মনে আছে মানিকদা প্রায়ই গাইতেন-"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে" গানের কথাগুলো যে এত তাড়াতাড়ি বাস্তবে রূপ নেবে কখনও কি ভেবেছিলাম? সত্যি আমাদের মানিকদা অকালে হারিয়ে গেলেন চিরকালের জন্য। তাঁর অভাব প্রতিনিয়তই আমাদের মনকে নাড়া দেয়।

Ghunati.com

পরবর্তী পর্যায়ে মানিকদা আমার ছোট বোনের স্বামী হয়ে আমাদের সবার আরও কাছাকাছি এসেছিলেন। আমার এবং আমাদের পরিবারের আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। সকলের আনন্দ বেদনার সমান অংশীদার ছিলেন তিনি। অনেক সমস্যার সমাধান এত সহজেই দিতেন যেটা আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না। কখনও কোন কিছুতে অস্থির বা বিচলিত হতেন না। হাসি মুখে সমস্যার মোকাবেলা করতেন। অত্যন্ত বড় মাপের হৃদয় ও ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। তিনি সব সময় বলতেন "বাঙ্গালীরা হাসতে জানে না; প্রাণ খুলে হাসবে, দেখবে মন ভাল থাকবে, সমস্যা কিছু থাকলে সেটাও হাল্কা হয়ে যাবে।"

দীর্ঘ চার বছর শারীরিক অসুস্থতা ও যন্ত্রণা নিয়ে কাটিয়েছেন কিন্তু আমরা তাঁর মুখে একটি বারের জন্যও অসুস্থতার আহাজারি শুনিনি। বরং আমরা আত্মীয়-স্বজনরা ছিলাম উৎকন্ঠিত। মাঝে মাঝেই তাঁর কাজ-কর্মকে কমিয়ে আনার পরামর্শ দিতাম। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। তাঁর দৈনন্দিন কাজ, অফিসের কাজ, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর নেয়া সবই ঠিক ঠিক করেছেন হাসপাতালে যাবার আগের দিন পর্যন্ত। এ রকম একজন অসীম শক্তিধর মনের অধিকারী ব্যক্তিত্বকে আমার পরম শ্রদ্ধা জানাই।

আমরা এমন একজন ব্যক্তিত্বকে হারালাম যার তুলনা তিনি নিজেই। আমাদের ক্ষতি অপরিসীম। আমাদের অনেক আনন্দ দিয়েছেন তিনি কিন্তু জীবনের এই অতি স্বল্প পরিসরে বিদায় নিয়ে সবাইকে বেদনার্ত করে চলে গেলেন অনন্তালোকে। আমরা সবাই তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ডঃ শফিক আহমদ খান ঃ তাঁকে যেমন দেখেছি

মুহম্মদ আবুল মনসুর
ফরেস্ট রেঞ্জার
সুন্দরবন বিভাগ, খুলনা।

মানুষ মরণশীল। তাই এই নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ আসে, মানুষ যায়। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা কিছু স্মৃতি রেখে যান যা চিরদিন মানুষের মনে জাগরুক থাকে। তাঁদেরই একজন মরহুম ডঃ শফিক আহম্মদ খান। ডঃ শফিক আহম্মদ খান- একটি নাম, যা মনে পড়ার সাথে সাথেই মানসপটে ভেসে ওঠে শান্ত, সুন্দর, সদালাপী, বন্ধু বৎসল, পরোপকারী, সর্বোপরি নিরহংকারী একজন মানুষের প্রতিকৃতি। মানুষের যতগুলো গুণ থাকে তার সবক'টিরই সমাবেশ ঘটেছিল ডঃ খান-এর মাঝে। আজ তাঁর মৃত্যু-বার্ষিকীতে প্রকাশিত স্মরণিকায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত ধন্য মনে করছি। আমি কোন লেখক নই বা লেখার অভ্যাসও আমার নেই। তবুও মনের টানে সর্বোপরি শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে তাঁর সম্বন্ধে দু-চার কথা লিখতে আমার এ প্রচেষ্টা।

ডঃ শফিক আহম্মদ খান-এর জন্ম চট্টগ্রামের চুনতির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বংশীয় পরিচয় মানুষের কপালে লেখা থাকে না। তার পরিচয় পাওয়া যায় তার ব্যবহারে, কথাবার্তায়, আচার-আচরণে। ডঃ খান যে সত্যিই একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় তা তিনি তাঁর ব্যবহার, আচার-আচরণেই প্রমাণ করেছেন। এ ব্যাপারে সবাই নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন। মরহুম ডঃ খান আমার কোন আত্মীয়ও নন। এমন কি তাঁর অধীনে চাকরি করার দুর্লভ সৌভাগ্যও আমার হয়নি। তবুও বন গবেষণাগার এবং রাঙ্গামাটিতে চাকরিকালীন সময়ে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। এই স্বল্প পরিচয়ে তাঁর সম্বন্ধে যতদূর জেনেছি- নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত একজন সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর প্রাণ-উচ্ছল হাসি, সুমধুর আলাপ, সুন্দর বাচনভঙ্গি, নিরহংকারী মন সব মানুষকেই আকৃষ্ট করত। তাই ছোট-বড় প্রত্যেককেই সব সময় তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতে দেখেছি। অর্থাৎ বলতে গেলে তাঁর কোন শত্রু ছিল না। তাঁর অকাল মৃত্যুর পর সবাইকে আপসোস করতে দেখেছি। সবাই বলেছেন-এ রকম একজন মহৎ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ এত তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলেন !

তাঁর সম্পর্কে এতক্ষণ যে-সমস্ত গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছি তার বাস্তবচিত্র নিম্নরূপ ঃ

বন বিভাগে তাঁর পরিচিত অধঃস্তন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে দেখা হওয়ার সাথে সাথেই তিনি তাদের সাথে করমর্দন করতেন, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন- আপ্যায়ন করাতেন, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল- যাকে বলে গায়ে পড়ে উপকার করা- প্রত্যেককে তিনি জিজ্ঞেস করতেন "যেখানে আছ, কোন অসুবিধা নেই তো? অসুবিধা থাকলে বলবে"। কত মহৎ হৃদয়ের অধিকারী যে তিনি ছিলেন এতে তার প্রমাণ মেলে।

ইউ, এস, এফ, বন বিভাগ রাঙ্গামাটিতে যখন তিনি ছিলেন তখন তাঁর অধীনস্থ অফিসের কর্মচারী এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীরা রাঙ্গামাটির অদূরে এক বন-ভোজনের আয়োজন করেন, যার উদ্যোক্তা তিনি স্বয়ং। কর্মচারীদের আনন্দ ফূর্তিতে রেখে সরকারি কাজ আদায়ে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঐদিন ঐ অনুষ্ঠানে আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম। দেখেছি তাঁকে খাবারের থালা হাতে গাছতলায় বসে সকলের সাথে খানা খেতে এবং মাঝে মাঝে উঠে দেখতেন সকলে ঠিকমত খেতে পারছে কি না- যা সত্যিই অতুলনীয় এবং প্রশংসার দাবিদার। তাঁর পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে সাধারণতঃ এরূপ আচরণ আশা করা যায় না। এগুলো হচ্ছে আমার দেখা ঘটনা, এর চেয়েও অধিক গুণের অধিকারী যে তিনি ছিলেন তা সর্বজনবিদিত। এগুলো লিখে শেষ করা যাবে না। তাঁর মতো একজন মহৎ ব্যক্তিত্বকে যে এত তাড়াতাড়ি হারাবো তা কল্পনারও বাইরে ছিল। তাই তাঁর মৃত্যু-সংবাদে নিথর, নিশ্চুপ হয়ে পড়েছিলাম। অজান্তে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে।

সমাজে আজ ভাল লোকের খুবই অভাব। আজ তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা, আল্লাহ্ যেন তাঁকে বেহেশ্‌ত নসিব করেন এবং তাঁর মতো মহৎ ব্যক্তিত্বের সন্ধান যেন আমরা পাই- যাঁদের দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে। দেশ উপকৃত হবে। আমীন।

* * *

যে স্মৃতি ভোলা যায় না

শহীদ আহমদ খান (মন্টু)
ডেপুটি বাড়ী, চুনতি।

ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ তখন ছিল একটি সুন্দর ছোট্ট মহকুমা শহর, একটি বিরাট শিশুবৃক্ষ প্রায় একশ' বছরের পুরানো, ঘরের পাশে ছবির মত দাঁড়িয়ে। সামনে বিস্তৃত ফুলের বাগান, নীচে বয়ে যাচ্ছে ধলেশ্বরী নদী, উচ্ছল গানের শিহরিত ছন্দে।

১৯৩৭ ইং ১৩ই ডিসেম্বর। একটি উজ্জ্বল দিন। মনে পড়ে সেদিন ছিল রবিবার। ১লা শ্রাবণ। সেদিন যতদূর মনে পড়ে ছুটির দিন ছিল। মুক্ত আনন্দের দিন। আমাদের বাড়ির সামনের শিশু নিকেতন বন্ধ ছিল। বড় আপা (মরহুমা সামসুন্নাহার বেগম) ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েন। আমার বয়স ৫/৬ বৎসর। তাঁর মুখে সেদিন সে কি আনন্দ, এত আনন্দ হাসি, গান আর কোনদিন দেখিনি। হঠাৎ তিনি কেন এত আনন্দে মাতোয়ারা তা বুঝতে পারিনি। শুধু আমাকে আদর করতে করতে বারবার বলছিলেন- আমাদের একটি সুন্দর ফুটফুটে ভাই হয়েছে।

আমার আব্বা মরহুম কবীরুদ্দিন আহমদ খান তখন মানিকগঞ্জের 'Sub Deputy Magistrate' মানিকগঞ্জে জন্ম হয়েছে বলে ভাইটির নাম রাখা হল 'মানিক'। ওর জন্মের পর কি যে উৎসব হয়েছিল, সে চাকচিক্য সে ঔজ্জ্বল্য ভুলব না কোনদিন।

এরপর ১৯৩৯ সালের শুরুতে আব্বা বদলি হলেন তৎকালীন ফেনী মহকুমায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলছে তখন।

একদিন ছোট ভাইটি হঠাৎ আবদার জুড়ল হরিয়ালের মাংস খাবে। মা কোথায় পাবেন হরিয়াল? অনেক বুঝিয়েও কোন লাভ হল না। শেষ পর্যন্ত মা ধৈর্যহারা হয়ে গালে ছোট্ট একটি চড় দিলেন। আর যায় কোথা! আমার মনে পড়ে সেদিন, সে রাত্রির কথা- সারারাত সে ঘুমাল না। শুধু কাঁদলো। বাবা, মা তার সাথে জেগে রইলেন। শেষ রাতে মানিকের জ্বর এলো। জ্বর কিছুতেই কমে না। বাসার সকলে উদ্বিগ্ন। দীর্ঘ ৭ দিন সে ভুগলো। আমরা কত কিছু মানত করলাম। আব্বা, আম্মার ঘুম হারাম হয়ে গেল। সে সেরে ওঠার পর আব্বা, আম্মা, আমরা ভাই-বোনরাও কী যে খুশি হয়েছি তা বলে বোঝানো যাবে না। পরে অবশ্য আব্বা হরিয়াল শিকার করে এনেছিলেন ওর জন্য।

যুদ্ধ একটু স্তিমিত। আবার আব্বা বদলি হয়ে এলেন রামগড় মহকুমায় এস,ডি,ও, হয়ে। এখানেও মানিককে নিয়ে হল বড় মুসকিল। কখনও নির্জন দুপুরে ছোট ছোট পা ফেলে যখন-তখন অনেক নীচে নদীর দিকে রওনা দিত। আমাদের বাসার নিকটেই উন্মুক্ত সগর্জন প্রবাহিতা উন্মাদিনী ফেনী নদী। তখন ঘোর বরষা। নদী খরস্রোতা। শিশু তো দূরের কথা, যে কোন বড় মানুষ মুহূর্তে তলিয়ে যাবে নদী গর্ভে।

একদিন এক অলস মধ্যাহ্নে আমাদের ছোট্ট 'মানিক' সবার অজান্তে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল ঐ মৃত্যু সায়রে। সৌভাগ্যবশতঃ তখন আমাদের যদু, মধু নামে দুটি

ভাল্লুক ছিল, তারা দেখে ধুলায় লুটুপুটি করে গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে। ওদের লুটাতে দেখে আমাদের ময়না চিৎকার করে ডেকে ওঠে- "খোঁকা খোঁকা"। এতে অতন্দ্র প্রহরী মোহাম্মদ হোসেনের সুখনিদ্রা ভেঙ্গে যায়। সে দৌড়ে গিয়ে দেখে, খোকা মানিক ধীরে ধীরে এগুচ্ছে- আর একটু এগুলেই নীচে গভীর খাদে পড়ে যেত। একটি ভয়ঙ্কর রক্তহিম মুহূর্ত।

মোহাম্মদ হোসেন লাফ দিয়ে খোকনকে কোলে তুলে নেয়। এই ছিল আমাদের মানিক, শিশুকাল থেকে আগ্রহী, ভয়হীন, কোন কিছু আবিষ্কারে উদ্দাম-চঞ্চল, যায় যাবে যাক প্রাণ, সে ছিল অকুতোভয় নির্ভীক শিশুকাল থেকে।

সকালটাই বলে দেয় দিনটা কেমন যাবে। এ শিশু তার শৈশবে যে মহড়া দেখালো তাতে আব্বা স্থির-নিশ্চিত ছিলেন যে ও বড় হয়ে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবে। সে হবে কঠোর জীবন-সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক।

বহুগুণে গুণান্বিত আমার সে প্রিয় ছোট ভাইটি শৈশব থেকে এভাবে শশীকলার মত বাড়তে থাকে। একদিকে সে সঙ্গীত পাগল, অন্যদিকে দুঃখী মানুষের দুঃখে আকুল। সৃষ্টিকর্তা বুঝি তাদেরকে শৈশব থেকে এভাবেই গড়ে গেলেন। অতি যত্নে, স্নেহে, আদরে।

১৯৪৫ সাল- আব্বা বদলি হলেন কোলকাতায়। তখন তার বয়স ৭ বছর। বিরাট শহর কোলকাতা। আমি, বড় ভাই এবং মানিককে সংগে করে ঘুরে বেড়াতাম কখনও ওয়েলেসলী, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, ধর্মতলা, বালীগঞ্জ, পার্ক সার্কাস অথবা গড়ের মাঠ- কখনও ভিক্টোরিয়া মনুমেন্টে। কিছুদিন থাকার পর আম্মা ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে চলে গেলেন দেশে। আমরা বড় তিন ভাই থাকলাম আব্বার সংগে। সবাই স্কুল-কলেজে পড়ি।

এর পর দেশ বিভাগ হোল। আব্বাও বদলি হয়ে এলেন নোয়াখালী। তখন মানিক রীতিমত একজন স্কলার। ফাইভ-এ বৃত্তি পেল। আবার ক্লাস এইটে পেল মেরিট স্কলারশীপ- নোয়াখালী জেলা স্কুল থেকে।

নোয়াখালী থেকে জামালপুর, তারপর হবিগঞ্জ এবং শেষে ময়মনসিংহ। মানিক ততদিনে পৌঁছেছে তার দুরন্ত কৈশোরে। মানিক তখন টিকটিকি, ব্যাঙ, আরশোলা, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, প্রজাপতি নিয়ে ব্যস্ত। এগুলো ধরবে আর অজস্র প্রশ্ন করবে- ওরা এত সুন্দর কেন? কোন্ বংশের? এত রং ওরা কোথা থেকে পায়? (টিকটিকি টিকটিক করে কেন ইত্যাদি।)

ও বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে (জীব বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান) বেশ তৎপর থাকলো কিছুদিন। এরপর ম্যাট্রিক পরীক্ষা এলো। সে খুব মনোযোগী ছাত্র হয়ে গেল আবার। পরীক্ষা শেষ হোল। রেজাল্টও বের হল, দেখা গেল ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

এরপর মানিক চলে গেল কুমিল্লায় ছোট চাচার ওখানে। ভর্তি হোল ভিক্টোরিয়া কলেজে। কারণ আব্বা ৩ বছর আগেই রিটায়ারমেন্টে চলে গেলেন শারীরিক অসুস্থতার

কারণে। আমি ইতিমধ্যে কলেজের পাঠ চুকিয়ে চাকুরির জন্য করাচী চলে গেলাম। তবে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল ওর সাথে। সুখে-দুখে দিন চলে যাচ্ছিল। মানিক আই, এসসি, পাস করে ঢাকায় চলে গেল। আমি বার কয়েক করাচী থেকে আসলাম-গেলাম। সে তখন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া চাচী আম্মা বেগম সুফিয়া কামালের বাসায় থেকে পড়াশুনা করতে লাগলো। মাঝে মাঝে ২/১টা টিউশনি করতো হাত খরচ চালানোর জন্য। ১৯৬০ সালের দিকে মানিকের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। পূর্ব পাকিস্তান ফরেস্ট সার্ভিসে যোগদান করল। বলা বাহুল্য M.Sc-তে First class First হওয়ার কারণে সুযোগটা এসে গেল।

হঠাৎ করে করাচীতে আমার সাথে দেখা। ওরা ট্রেনিং-এ গেছে। কত যে খুশি হয়ছি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান তাঁর নিজস্ব ক্ষমতাবলে করাচীকে প্রভিন্স ঘোষণা করলেন, আমাদের সার্ভিস প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস হিসেবে গণ্য হল। আমি ট্রান্সফার হয়ে সি.এম.এ.-তে (কনট্রোলার মিলিটারী একাউন্টস্)। ওখানে ব্রিগেডিয়ার জাহান্দাদ খান-এর পি, এ, হিসেবে যোগদান করলাম। সেই সূত্রে সাহেবের সাথে মিঞাওয়ালী, জহুরাবাদ, রিসালপুর মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পেশোয়ার ক্যান্ট, কাকুল মিলিটারী একাডেমি, মারী নানান জায়গায় সফর করলাম।

মানিকের সাথে দেখা হোল রিসালপুরে। ওদের তখন মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চলছিল। অত কঠোর প্রশিক্ষণেও তাকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। জীবনের কোন হার্ডশিপকে খুব বেশি পরোয়া করতো না। অভাবও চলছিল, কেননা, তখন তারা শুধু ট্রেনিং এলাউন্স পেত।

ট্রেনিং শেষে তার পোস্টিং হলো এ, সি, এফ, হিসেবে উত্তর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নারায়ণ হাট ফরেস্ট রেঞ্জে। পরবর্তী জীবনে আমি তাকে একজন পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন ডি, এফ, ও, হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখলাম।

চাকুরি জীবনে সে ছিল একজন উদারভাবাপন্ন অফিসার। নিম্নপদস্থ অফিসার থেকে স্টাফ পর্যন্ত সবাই তাকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। উপরিস্থ অফিসারেরা তাকে বিশ্বাস করতেন, ভালবাসতেন। এর পর চাকুরি সূত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পোস্টিং হয়েছে। কর্মের সাথে অর্জন করেছে প্রচুর সুনাম। বিভিন্ন সেমিনারে যোগ দিতে দেশের বাইরে গিয়েছে বহুবার। যেমন শ্রীলংকা, ব্যাংকক, ভারত, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, লণ্ডন ইত্যাদি।

যুগোস্লাভ ভাষা শিখে, সে ভাষায় অত্যন্ত মূল্যবান থিসিসের উপর লাভ করলো পিএইচডি/ডিএসসি ডিগ্রী। ডিগ্রী নিয়ে তারপর দেশে ফিরে আসে। ওর তখন পোস্টিং ছিল ষোলশহরস্থ বন গবেষণাগার সিল্‌ভিকালচারিস্ট হিসেবে। চার বছর ওখানে ছিল। তারপর রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ময়মনসিংহ এবং সিলেটে।

এর মধ্যে আমার ব্যস্ততার কারণে ওর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কমতে লাগলো। একবার সিলেট গিয়েছিলাম ওর বাসায়। অনেক গল্প, অনেক কথা হল পারিবারিক

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। সদাহাস্যময় ভাইটি সেই আগের মতই ছিল প্রাণবন্ত।

হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ওর অসুস্থতার সংবাদ পেলাম। ইতিমধ্যে ওরা চলে গেছে ব্যাংকক- চিকিৎসার জন্য। আত্মীয়-স্বজন, আমরা ওর রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর করুণা ভিক্ষা মাগি।

ও ফিরে এলো সুস্থ হয়ে। আমরা আশ্বস্ত হলাম। এবার হাল্‌কা কাজের চাপ থাকে মতো জায়গায় অর্থাৎ চট্টগ্রামের নন্দনকাননস্থ বন বিভাগে (ইউটিলাইজেশন) তার পোস্টিং হল। আমরা সবাই ভীষণ খুশি। কারণ অনেক দিন দেশের বাইরে থাকার পর আবার আমাদের মাঝে ফিরে এলো। চিকিৎসার পরবর্তী ৩ বছর কেটে গেল আশংকাহীনভাবে। আবার ছন্দ পতন।

এবার শুনলাম দাঁত তোলার পর দাঁতের মাড়িতে ইন্‌ফেক্‌শন হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করানো হল। এরপর খুব দ্রুত ঘটে গেল সব। ঐতিহাসিক ৫ই জুন ১৯৯২, রোজ শুক্রবার, বেলা ১২.১০ মিনিটে হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিভে গেল একটি উজ্জ্বল বর্তিকা। ইন্নালিল্লাহে......... রাজেউন।)

তাকে ধরে রাখতে পারিনি। ডাক্তারদের শত চেষ্টা, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের ফরিয়াদ উপরওয়ালা অগ্রাহ্য করে সকলকে শোকের সায়রে ভাসিয়ে পরম আদরে আশ্রয় দিলেন আপন আলয়ে।

আমি এখনও পর্যন্ত পারছি না সে শোক ভুলতে। আমার বুক ভেঙ্গে যায়, নীরবে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে- যখন মনে পড়ে আমার একান্ত আদরের ছোট ভাইটি চলে গেছে সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এটুকু সান্ত্বনা পাই তখনই যখন আমি অনুভব করি- একদিন যে ফুল ফুটেছিল, তার সৌরভে আকাশ-বাতাস এখনও সুবাসিত।

স্মৃতিপটে ডঃ শফিক খান
একজন কর্মচঞ্চল, দায়িত্বশীল ও জ্ঞানানুরাগী প্রাণ-পুরুষ

সেলিম আজম
ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার
বাংলাদেশ বিমান

ছোট ফুফুর চিঠি পেলাম ফুফার স্মৃতিতে কিছু লেখার জন্য। ভীষণ কঠিন ব্যাপার। আর স্মৃতি বিশেষ করে কোন প্রিয়জনের যদি হয় তা কালিতে প্রকাশ করা বোধ হয় আরোও অসম্ভব, যন্ত্রণাদায়ক। এমনিতে আমার লেখার অভ্যেস নেই; যোগ্যতারও অভাব রয়েছে। তবে কোন সত্যি জিনিস বর্ণনা করা বোধ হয় সবার পক্ষেই সম্ভব। এ ভরসাতেই কলম ধরলাম।

যাঁর সম্পর্কে লিখতে বসেছি তাঁকে যতটুকু কাছে থেকে দেখেছি আমার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে কর্মজীবনাবধি তাঁর নির্মল স্মৃতির ভাণ্ডার যে কত বিস্তৃত তা লিখতে বসে বুঝতে পারছি। একটা ঘটনাকে চিন্তা করতে গিয়েই আরেক ঘটনা উঁকি দিচ্ছে মনের কোণে। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা লিখব খেই হারিয়ে ফেলছি।

মানিক চাচা, এখানে বলে রাখছি আমার বাবার নামও মানিক, আর দু'মানিক বন্ধু ছিলেন বলে আমি এবং আমার ভাই-বোনেরা চিরাচরিত 'ফুফা' শব্দটা ব্যবহার করতাম না; যখন আমাদের পরিবারে জামাই হয়ে এলেন তখন আমি ক্লাস সেভেন-এ পড়ি, গ্রামের স্কুলে। গ্রামের ছেলে-মেয়েদের কাছে পদস্থ অফিসার তার উপর গুরুজন, যথেষ্ট গুরু-গম্ভীর ও ভীষণ রকমের একটা-কিছু বলেই প্রতীয়মান ছিল। এই সৌম্য দর্শন, নধর কান্তি ফুফাকে যেদিন আমার বাবা-চাচারা গ্রামের বাড়িতে স্বাগত জানালেন সেদিন আমি দূরে থেকে ভীরু চিত্তেই সে দৃশ্যটা দেখেছিলাম। এর পর যখন চাচার কাছে এসেছি তখন সব ভয় কেটে গিয়েছিল। উনি আমাদের সাথে কথা বলেছিলেন স্বরসিকতায়। এমন-কি কাজের লোকজনের সাথেও উনি যেভাবে রসিয়ে কথা বলেন তাতে গুরুভয় উবে গিয়ে আমি ওনার আরো কাছাকাছি হতে পারলাম।

এর পর সময় বয়ে গেল। আমি স্কুলের পাঠ শেষ করে কলেজে ভর্তি হবার জন্য শহরে গেলাম। ফুফু চাটগাঁ থাকেন বলে ঠিক হ'ল সেখানে থেকেই পড়ব। আব্বা তাঁর মিতাকে আমার অভিভাবকত্ব দিয়ে আমাকে পাঠালেন সেখানে। চাটগাঁ কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে দেখি রেজাল্ট সিটে আমার নাম নেই। এমন অবস্থায় ফুপা ওনার বন্ধুর বন্ধুকে, যিনি তখন ঐ কলেজের অধ্যাপক, যোগাযোগ করলেন। আমার অন্য এক চাচাকেও ডাকলেন কি করা যায়। কারণ দায়-দায়িত্ব আপাততঃ ওনারই। ঐ চাচাই আবার আরেক অধ্যাপককে চিনতেন। তিনি পরদিন জানালেন আমি ভর্তির জন্য কোয়ালিফাই করেছি। আসলে আমার নাম সম্বলিত রেজাল্ট সিটের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে যাওয়ায় আমি অফিসে যোগাযোগ না করেই ধরে নিয়েছিলাম ফেল। চাচার খবরে সবাই স্বস্তি পেল।

Ghunati.com

আমার কলেজে পড়ার সময়ে চাচা ডক্টরেট করতে যুগোস্লাভিয়া যান। মাঝে মাঝেই ওনার পাঠানো চিঠিতে ওদেশের আবহাওয়া-আচার-কৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পারতাম। চমৎকার গুছিয়ে বর্ণনা করতেন। সব চাইতে বেশি মনে পড়ে ওনার ভ্রমণ কাহিনী সম্বলিত ক্যাসেট-এর কথা। ভ্রমণ পথে রোম নগরী দেখে মন্তব্য করেছিলেন- "আমি বাঙ্গাল আজ সত্যিই হাইকোর্ট দেখলাম।" কথাটা এ মুহূর্তে আরো বেশি মনে পড়ছে বিদেশের এক উঁচু দালানের প্রকোষ্ঠে বসে লেখার কারণে আর মানিক চাচার প্রাঞ্জল উদ্ধৃতিবহুল ধারা বিবরণীর নিদর্শন প্রকাশার্থে।

আমি কলেজে পাঠশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই (BUET) ঢাকায় এসে। এর মধ্যে চাচাও বদলি হন বন বিভাগের বিভিন্ন যায়গায়। বন বিভাগে ওনার সুনাম ছিল ভালো অফিসার হিসেবে। সেটা আমি চাক্ষুষ দেখলাম বেড়াতে বেরিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের খাই খাই, আউটিং ও পিক্‌নিক্ করার একটা ভীষণ ঝোঁক ছিল। একবার সামরিক সরকার হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। ঠিক হ'ল বন্ধুদের নিয়ে বাইরে ঘুরে আসার। পাড়ি দিলাম রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে দশ/এগারো জনের একটি দল। রাঙ্গামাটি পৌঁছে দেখি চাচা নেই সেখানে, অন্যত্র কাজে গেছেন। আমাদের সব প্রোগ্রাম পণ্ড হবে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু না, ওনার অফিসে আগেই খবর দেয়া থাকায় সবাই সাহায্য করেছে ওখানে ঘুরে বেড়াতে। এরপর মধুপুরের গড় আর সিলেট ভ্রমণও হয়েছে একই কারণে।

চাচার সাথে আমার ডজন খানেক বন্ধুর দলের দেখা হয় মধুপুর বনের রেস্ট হাউসে, দিনের শেষ বেলায়। কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে সেখানে কাজ করছিলেন তিনি। বন্ধুরা ফুপাকে দেখে ভাবলো বনের বাঘের সাথেই সাক্ষাৎ হতে যাচ্ছে। আমাদের কিছুক্ষণের জন্য তিনি বসিয়ে কাজ শেষ করলেন তারপর সবাইকে নিয়ে বসালেন গল্পের আসর। সান্ধ্য চা-পর্ব শেষ হ'ল, বুনো পরিবেশে নিবিড় গল্পের মাঝে কখন যে রাত ন'টা বাজলো টেরই পেলাম না। তাড়াতাড়ি রাতের খাবার শেষ করে চাচা সবাইকে নিয়ে বসলেন বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস-এ বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি শোনার জন্য। কারণ, সামরিক এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে তখন ছাত্র-জনতার সংগ্রাম তুঙ্গে উঠেছিল। আলোচনা চলল নানা বিষয়ে অনেক রাতবধি। বন্ধুরা ব্যাঘ্র ভয় হারিয়ে আসন পেল বিশাল মনাঙ্গনে। এমনই ছিল তাঁর গল্প বলার আর অপরিচিতদের সাথে মিশে যাবার দারুণ ক্ষমতা। নীচু-উঁচু সব ধরনের মানুষ-এর সাথেই তিনি মিশতে পারতেন চমৎকার সাবলীলতায়, যা খুব কম লোকের মাঝেই আমি দেখেছি।

বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে কর্মজীবনে পা দিই ৮৭ সালে, তখন কাজের চাপে যোগাযোগ কমে যায়, কিন্তু যখনই দেখা হত আলোচনা হত অনেক, ধারণা ও উপদেশ পেতাম প্রয়োজনীয় বিষয়ে। জীবনপ্রবাহে কেউ কি তৈরি থাকে দুঃসময় বা দুঃসংবাদের জন্য। কে জানত এক ভয়ানক সময় প্রায় দ্বারে! তার কিছুদিন পরই জানা গেল তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। জীবনের ছন্দপতন হ'ল বাজের মত। বুদ্ধিমান লোক তিনি, আমরা লুকাতে চাইলেও বুঝে ফেললেন ঘাতক ব্যাধিটি কি। সব জেনে-শুনে মৃত্যুর সাথে লড়ে যান তিনটি বছর।

Ghumati.com
Pioneer in village based website

এই অসুস্থতার মধ্যেও দেখেছি তাঁকে আত্মীয়-পরিজনের খবর নিতে, কারো দুঃসংবাদে বিচলিত হতে। এমন কি হাসপাতালে ভীষণ অসুস্থাবস্থায় টেলিভিশনে যুগোস্লাভিয়ার দাঙ্গা দেখে বিমর্ষ হয়েছিলেন। এক সময় সুন্দর পরিবেশে তিনি ঐ দেশেরই সারায়েভো শহরে কাটিয়েছিলেন অনেকগুলো দিন।

ক্যান্সার রোগটা যে কি ভয়ানক তা কাছ থেকে উপলব্ধি করলাম চাচাকে দেখে। এ রোগ মানুষকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দেয়।

তবে আশ্চর্য ব্যাপার, ওষুধ প্রয়োগে যখনই একটু ভালো বোধ করতেন তখনই দেখতাম তাঁকে অফিসে যাচ্ছেন, ডুবে যাচ্ছেন কাজে, দাপ্তরিক এমন কি সামাজিক সমস্যারও সমাধান দিচ্ছেন। কাজ ছাড়া উনি থাকতে পারতেন না। হাসপাতালে শুয়ে থেকেও দস্তখত করেছেন জরুরী কাগজ, চিন্তা করেছেন অধঃস্তনদের কথা।

হাসপাতালে রক্ত, ওষুধ এসব ড্রিপ দিতে হত। কত যে সুঁই ফোটাতে হয়েছিল, কিন্তু বিস্মিত হয়েছি ওনার সহ্যশক্তি দেখে। একবারও যন্ত্রণায় 'উহ্' শব্দ করেন নি। যন্ত্রণার কোন বহিঃপ্রকাশই ছিল না।

শেষ মুহূর্তগুলোতে কাজের ব্যস্ততায় আমি সবসময় কাছে থাকতে পারিনি। একবার কাছে যেতে বলেছিলেন- "আমার আর বেশি সময় নেই", পরক্ষণেই হাসিমুখ করেছেন যাতে আমরা ও স্ত্রী-কন্যা-পুত্র সবাই বিমর্ষিত বা আতংকিত না হই।

অবাক লাগে, যে যাচ্ছে চলে, সে নিজে হেসে দূর করতে চাচ্ছে অন্যের ভয়! যেমন অস্তগামী সূর্য রাঙ্গিয়ে দিয়ে যায় পুরো আকাশ। আর এই হাসিমাখা মুখ নিয়েই ১৯৯২ সালের ৫ই জুন তিনি হারিয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য, নিভে গেল প্রদীপ না কি অস্ত গেল রবি! আমরা হারালাম আমাদের সবার প্রিয়, সদানন্দ প্রাণপুরুষকে, যিনি আমার কাছে ছিলেন গুরুজন, অভিভাবক ও বন্ধু।

ডঃ এস,এ,খানকে যেমন দেখেছি

মতলুবুর রহমান চৌধুরী
ফরেস্ট রেঞ্জার, সিলেট।

সিলেট বন বিভাগেই প্রথম আমার প্রয়াত জনাব শফিক আহমদ খানের সংগে পরিচয়। ১৯৮৯ ইং এক শরতের বিকেলে তিনি সিলেট বন বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সিলেট বন বিভাগ গোটা বাংলাদেশের মধ্যে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে সমৃদ্ধ। স্বাভাবিকভাবে বন বিভাগের ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন জটিলতা বর্তমান। শত শত স্বত্ব মামলা বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন। এসব স্বত্ব মামলা বিভিন্ন জটিলতায় বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিজ্ঞ দিঙ্- নির্দেশনা আমাকে আমার কাজে, বিশেষ করে স্বত্ব মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাকে আরও গতিশীল করে তুলেছিল। বিভিন্ন খসড়া তৈরির জন্য তিনি আমার উপর দায়িত্ব অর্পণ করতেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমার বিশ্বাসযোগ্যতাকে ফুটিয়ে তুলতেন।

হবিগঞ্জ রেঞ্জের কালেংগা বনাঞ্চলে যে অনুপ্রবেশকারীরা অবস্থান করেছিল, বনাঞ্চলের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের প্রকাশ থেকে তিনি এই জবরদখলকারীদের উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সেই সময়ে আমি দেখেছি সিলেট সদর, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসকের বিভিন্ন দায়িত্ববান কর্মকর্তাগণ তাঁকে কি সমীহ এবং সম্মান করতেন। গুণীরা গুণীদের কদর বোঝেন। ডঃ খান এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁকে সম্মান করে পরোক্ষভাবে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা নিজেরাই সম্মানিত হয়েছেন। তৎকালীন মৌলভীবাজার জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রেজওয়ানুল হক সাহেবকে দেখেছি যখনই ডঃ খান তাঁর কার্যালয়ে গেছেন, তিনি তাঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ করে ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। ডঃ খানকে সম্মান প্রদর্শনের জন্যই আমরা জনাব মোঃ রেজওয়ানুল হক সাহেবকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম।

তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এক ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তাও লক্ষণীয়। কালেংগা ইভিকশনের ব্যাপারে দেখেছি জনাব খান তৎকালীন হুইপ জনাব এস, এম, কায়সারের সঙ্গে এক আপোষহীন সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছিলেন। বনভূমি রক্ষায় ডঃ খানকে তখন দারুণ এক বৈরী পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে, কিন্তু তিনি কিছুতেই মাথা নত করেন নি।

তৎকালীন বন মন্ত্রী জনাব এ, কে, এম, মাইদুল ইসলাম আসলেন সিলেটে। আমরা তাঁকে সংবর্ধনা দিলাম। ডঃ খান আমাকে মন্ত্রীর অভিনন্দনপত্র লিখতে নির্দেশ দিলেন, যেখানে কালেংগা সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হল। মন্ত্রীকে ফুলের তোড়া দিতে গিয়ে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রুবাবকে এবং আমার মেয়েকে নির্বাচন করেন। তিনি যখন বদলি হয়ে চট্টগ্রাম চলে গেলেন, সিলেট আসলে একদিন তিনি আমার বাসায় আমার মেয়েকে দেখার জন্য আকস্মিকভাবে এসে পড়েন। আমাকে অত্যন্ত দরদ দিয়ে সেদিন

বলেছিলেন, "আমি শুধু আপনার মেয়েকে দেখতে এসেছি।" এমনই ছিল তাঁর ছোট শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ। এতে ডঃ খান ছোট হন নি। চিরদিনের জন্য আমার হৃদয়ে তিনি এক সুন্দর মানুষ, যাঁর মমত্ববোধকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমার যখন পদোন্নতি হল তখন ডঃ খানই ঢাকা থেকে আমাকে তারবার্তা প্রেরণ করেন এবং শুভেচ্ছা জানান। মহৎ হৃদয়বান না হলে একজন অধঃস্তনের প্রতি কি দারুণ প্রতীতি তিনি মনে করতেন, যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে আসেন নি তাঁরা কিছুতেই তা অনুধাবন করতে পারবেন না।

ডঃ খান যুগোশ্লাভিয়ার সারায়েভো ইউনিভার্সিটি থেকে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রী গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত উঁচু স্তরের বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। সিলেট থাকা অবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। সিলেটের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাজ্ঞ শিক্ষকদের সংগে তাঁর ভীষণ আন্তরিকতা ছিল। বৃহত্তর সিলেটের প্রশাসনের বিভিন্ন পদের কর্মকর্তাদের সংগে ছিল তাঁর গভীর সম্পর্ক।

তিনি যখন বদলি হয়ে চলে যান, তাঁর বিদায়ের প্রাক্কালে সংঘঠিত বিদায়ী অনুষ্ঠান ছিল সিলেট বন বিভাগের জন্য এক অনন্য উদাহরণ। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব হাসান ওয়ায়েজের মত বিজ্ঞ অধ্যক্ষ। সিলেট ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ জনাব এফ, এইচ, চৌধুরী- মহাব্যবস্থাপক, সিলেট পাল্প এবং পেপার মিল; ছিলেন মকবুল হোসেন, প্রাক্তন বন সংরক্ষক, প্রাক্তন সহকারী বন সংরক্ষক জনাব আব্দুল মজিদসহ আরও অনেকে। সকলেই সেদিন একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন ডঃ খান এক অনন্য মানুষ, এক বিরল ব্যক্তিত্ব।

ডঃ খান ছিলেন চট্টগ্রামের এক বনেদী মুসলিম পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতাও তৎকালীন বৃটিশ ভারতের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। "চুনতি ডেপুটি বাড়ী" দক্ষিণ চট্টগ্রামে সমধিক পরিচিত। ডঃ খানের আচার-আচরণে, কথা-বার্তায় তাঁর সেই আভিজাত্যবোধ প্রকাশ পেতো। সিলেট বন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে সিলেটের এমন কোন মানুষ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নি। যে কাজ প্রশাসনিকভাবে সম্ভব ছিল না তা তিনি মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বলেছেন। প্রত্যেক সাক্ষাৎপ্রার্থীর কথা তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। আমরা তাঁকে সিলেটের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সংগে দেখেছি- যাঁরা ডঃ খানকে সম্মান করেছেন এক মহৎ মানুষ হিসাবে।

তাঁর সহধর্মিণীকে দেখেছি সুযোগ্য স্বামীর যোগ্য সাথী হিসেবে। তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স। তাঁরা উভয়ে গড়ে তুলেছিলেন এক আদর্শ পরিবার। তাঁদের সন্তানদের দেখেছি এক অসাধারণ শালীনতাবোধ এবং উচ্চতর মানসিকতা বহনকারি হিসেবে। তা শুধু সম্ভব হয়েছে যোগ্য পিতা-মাতার যোগ্য দিক-নির্দেশনায়।

তিনি যখন অসুস্থ হয়ে বিদেশে গেলেন, ফিরে আসলেন সম্পূর্ণ ভাল হয়ে। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমি ভুলতে পারি না তিনি আমাকে একটি সার্ট উপহার

দিয়েছিলেন, যা আজও আমার কাছে স্মৃতি- যা আমি বড় সযতনে রক্ষা করছি। এ থেকেই আমার প্রতি তাঁর স্নেহ এবং বিশ্বাসকে বুঝতাম।

সিলেটের অনেকের কাছেই ডঃ খানের অনেক স্মৃতিচিহ্ন পড়ে আছে। শেষবারের মত তাঁর অসুস্থতার খবর শুনে হযরত শাহ্জালালের (রঃ) দরগায় তাঁর জন্য মিলাদ মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর রোগমুক্তির জন্য দরগার গ্র্যাণ্ড ইমাম হাফিজ মৌলানা আকবর আলী সাহেব প্রার্থনা করেন, যাঁর সংগে পূর্বে থেকেই তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল।

তাঁর মৃত্যু-সংবাদ আমাদের জন্য, যারা তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে ছিলাম তাদের জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। আমিই শুধু নই; সিলেট বন বিভাগে নিম্ন পর্যায়ের অনেক কর্মচারীদেরকে তাঁর জন্য আক্ষেপ এবং আহাজারী করতে শুনেছি।

মৃত্যু অবশ্যই জীবনের এক স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু তবুও কোন কোন মৃত্যুকে মন মানতে চায় না। ডঃ খানকে হারিয়ে বন বিভাগ একজন বিজ্ঞ ফরেস্ট অফিসারকে হারালো, দেশ হারালো এক মহৎ ব্যক্তিত্ব, আর আমরা হারালাম আমাদের সব চাইতে আপন শুভানুধ্যায়ীকে।

তাঁর সম্পর্কিত স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশের সংবাদ শুনে মিসেস খানকে ধন্যবাদ দিতে হয়। নিঃসন্দেহে তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী হিসেবে তাঁর স্বামীর প্রতি তিনি সব চাইতে সুন্দর দায়িত্ব পালন করছেন। এ দায়িত্ব তাঁর শুধু একারই নয়। আমাদের দায়িত্বও এখানে প্রচুর। কেন না, গুণীজনের স্বীকৃতি কাউকে ছোট করে না। সম্মানিত মানুষের সম্মান করলে নিজেও সম্মানিত হওয়া যায়।

পরিশেষে, আমি প্রয়াত ডঃ এস, এ, খানের পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। এতদ্‌সঙ্গে তাঁর পরিবার-পরিজনদের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

স্মৃতির সঞ্চয় হতে

রেহ্‌নুমা খান (দোলা)

আজ শূন্য ঘরে বসে সুখময় স্মৃতির পাতা উল্টে যাচ্ছি। কত কথা, কত স্মৃতি, সবটাই এত বেশী জীবন্ত যে, বারবার খেই হারিয়ে ফেল্‌ছি। আব্বুর শোবার ঘরে, পড়ার ঘরে, খাবার টেবিলে সর্বত্র তাঁর নিরব উপস্থিতি আমি অনুভব করি। মাঝে মাঝে চমকে উঠি, ঠিক যেন আব্বুর মত করে কেউ কথা বলল। 'দোলনমনি' বলে আব্বু যেন এক্ষুণি আমায় ডাকল। সেই ভরাট গলার মিষ্টি ডাক, সুর হয়ে যেন বাজছে ঘরের দেয়ালে দেয়ালে।

আমার ছোট্ট জীবন জুড়ে ছিল আব্বুর অপরিসীম স্নেহ-আদর। সেসব আদর থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়েছি ভাবলে বুকের ভেতরটা মুচ্‌ড়ে উঠে। কান্নায় গলা বুজে আসে। এটা একজন সন্তানের জন্য কত কষ্টের সেটা আমি ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করতে পারবেনা।

তিন ভাইয়ের পর আমার জন্ম। মার মুখে শুনেছি আমার জন্মের পূর্ব পর্যন্ত একটি মেয়ের জন্য তাঁর যে কি ভীষণ আকুতি ছিল। উৎকণ্ঠার দিন শেষে-সন্ধ্যা ও রাতের সন্ধিক্ষণে টেইলার্স ক্লিনিকে আমার জন্ম হলো। খবরটা পাওয়া মাত্র আব্বু জায়নামাজ বিছিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে শোকরিয়া আদায় করলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন একরাশ উপহার সামগ্রী নিয়ে। ক্লিনিকের সমস্ত ডাক্তার, নার্সকে সুগন্ধী (পারফিউম) বিতরণ করলেন। সবাইতো অবাক! আব্বুর আনন্দে তারাও আনন্দিত। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন-'ব্যাপার কি? আব্বু বললেন-''মোঘল সম্রাট আকবর তাঁর ছেলে হওয়ার খুশীতে রাজ্যের সবাইকে কস্তুরী বিরতণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কস্তুরীর সুবাস যতদূর পর্যন্ত ছড়াবে, তাঁর সন্তানের সুনামও যেন ততদূর পর্যন্ত পৌঁছোয়। আমি মোঘল সম্রাট না হলেও, আমি বনের সম্রাট (বন সংরক্ষক) তো বটেই! আর কস্তুরী বর্তমানে দুর্লভ বস্তু, তাই আতরের সুবাসে আপনাদের সুবাসিত করতে চাই।"

মেয়ে হলে যে, কেউ এত খুশী হয় তা আমি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেদিন আব্বুকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারতোনা।

আব্বু সেদিনই আমার নাম ঠিক করে ফেললেন-'দোলা'। আব্বুর মনে খুশীর 'দোলা' লেগেছিল। সবার মনে দোল দিতে পারি, অর্থাৎ আদরের মধ্যমনি হয়ে থাকতে পারি এ যেন তারই আয়োজন।

এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি, আব্বুর আদর্শ, স্নেহ, মমতা আর আম্মুর আঁচলের ছায়ায় ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলাম। আর প্রতিদিন পরিচিত হতে থাকলাম আব্বুর এক একটি গুণাবলীর সাথে। হাসি, আনন্দে ভরে থাকতো আমার শৈশবের সোনা ঝরা দিনগুলি।

এরই মধ্যে হঠাৎ ছন্দ পতন হল। আব্বুকে খুঁজে খুঁজে ফিরি সারা ঘরময়। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাইনা। কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে যাই, মাকে প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত করি- 'কোথায় আমার আব্বু? আব্বুকে এক্ষুণি এনে দাও'। আম্মু বলতেন-তোমার জন্য মস্ত বড় পুতুল আনতে গেছেন বিদেশে। বিদেশ কি তা বোঝার মতো বয়স নয় তখন আমার। আম্মু শান্ত করতেন এটা সেটা বলে। এরই মধ্যে শুনলাম একদিন আব্বুর গলা। খেলা ফেলে দৌড়ে এসে খুঁজতে লাগলাম আমার প্রাণপ্রিয় আব্বুকে। সবাই তখন বারান্দায় গোল হয়ে বসে ক্যাসেট শুনছে। আমি শুধু খুঁজছি আমার আব্বুকে। আম্মু কোলে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন-এর ভেতর আছে তোমার আব্বু। চুপ করে বসে শোন। আমার ছোট্ট মনে তাই যেন বিশ্বাস করেছিলাম। শান্ত হয়ে গেলাম। ক্যাসেটগুলো নিয়েই কেটে যেত আমাদের সারাদিন। বারবার আম্মু বাজিয়ে শোনাতেন। আব্বুর ভরাট গলায় আমার উদ্দেশ্যে বলা রাশিয়ান রূপ কথার গল্প, ছড়া, গান শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে যেতাম, আর স্বপ্ন দেখতাম। অনুভব করতাম আব্বুর আদর। তাই, আব্বু যে অনেক দূরে আছে তা বুঝতাম না কখনও। আব্বুকে পাঠানোর জন্য আম্মু সবাইকে নিয়ে ক্যাসেট করতেন। রনি ছড়া বলতো, বড় ভাইয়া কবিতা আবৃতি করতেন, মেঝ ভাইয়া ক্রিকেটের কমেন্ট্রি করতেন, আর আমি আধো স্বরে বলতাম 'হাট্টিমাটিম টিম', 'আতা গাছে তোতা পাখি' অথবা 'চাঁদ উঠেছে'.......... ইত্যাদি ছড়াগুলো।

সময় গড়িয়ে তিনটি বছর কেটে গেল। বিদেশ থেকে ফিরে এলেন আব্বু বিজয়ের মালা গলায় পরে। (পরে বুঝেছি আব্বু ফরেষ্ট্রির উপর Ph.D. করেছেন যুগোশ্লাভিয়া থেকে) আবার হইচই, আনন্দ, শুধু আনন্দ চারিদিকে। পাঁচলাইশের ফরেষ্ট বাংলোর পরিবেশ রাতারাতি বদলে গেল। এতদিন যেখানে সময় কাটতো নিরানন্দে, সেটাই পরিণত হলো স্বর্গরাজ্যে।

আবার হারিয়ে ফেলার ভয়ে, আব্বুকে সারাক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকতাম। হাসিমুখে মেনে নিত - আব্বু আমার সকল আবদার, অত্যাচার।

জীবন সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল অত্যন্ত সরল। লেখাপড়ার বাইরে কোন চিন্তা ভাবনা ছিলনা। পাখির ডানায় ভর করা সুন্দর জীবন তার আপন গতিতে চলছিল।

আব্বুর সাথে কত জায়গায় যে বেড়াতে গেছি তা বলে শেষ করা যাবে না। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখেছি। আব্বু ভালো ইতিহাসবিদ ছিলেন, তাই ঐ সব স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে সহজ ভাষায় ধারণা পেতাম। আমরা সব সময় আনন্দে থাকি, এটাই ছিল আব্বুর সকল আয়োজনের সারকথা। আব্বুর যেহেতু বদলির চাকরি ছিল, সেই সুবাদে অনেক জায়গায় থেকেছি, ঘুরেছি, বেড়িয়েছি। তার বেশীর ভাগই ছিল চিটাগাং এর বিভিন্ন জায়গায়। তারমধ্যে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, উল্লেখযোগ্য। এরপর বদলী হয়ে গেলাম ময়মনসিংহ-এ। ময়মনসিং এর বাংলোটি ছিল একেবারে নদীর (ব্রহ্মপুত্র) পাড়ে। ভীষণ সুন্দর। রোজ সকালে আব্বুর হাত ধরে নদীর পাড়ে হাঁটতে যেতাম। কিযে ভালো লাগতো! রনি, রুবাব, আমি, আম্মু, আব্বু, মেঝ

ভাইয়া, বড় ভাইয়া আব্বুর সাথে সাথে হাঁটতাম আর আব্বু তাঁর পুরোনো দিনের গল্প শোনাতেন আমাদের। আবার কখনও মজার ঘটনা। কখনও সুকুমার রায়ের ছড়া আবৃতি করতেন। কখনওবা রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ কবিতা।

এরই মাঝে হঠাৎ আবার বদলী। এবার সিলেট। এর আগে কখনও যাইনি, তাই বেশ ভালো লাগল নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ। বাংলোটাও চমৎকার। আম্মু নিজ হাতে বাগান করলেন। ছায়া ঘেরা ছোট্ট বাড়িটা হয়ে উঠল একটি শান্তির নীড়।

ভালোই কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন আম্মু বললেন 'তোমার আব্বুকে নিয়ে বিদেশ যেতে হবে'। কিছুই বুঝতে পারলামনা। কেননা আব্বুকে আমি দেখেছি রীতিমত সুস্থ। অসুস্থতার লেশমাত্র নেই কোথাও। আগের মতোই উচ্ছল, প্রানবন্ত। তারপর এক সময় আম্মু আব্বুকে নিয়ে রওয়ানা হলেন বিদেশের পথে। যাবার আগে এক ফাঁকে আম্মু আমাকে বললেন-'তোমার আব্বুর চিকিৎসার উদ্দেশ্যেই এই যাত্রা। মনের পর্দায় তখনো ব্যাপারটা সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন কোন ছবি ফুটে ওঠেনি। ছোট্ট রুবাব তখন মাত্র ৩ বছরের। একদিকে পুরো বাসার দায়িত্ব আর অন্যদিকে ছিল উৎকণ্ঠা। আম্মু মাঝে মাঝেই ব্যাংকক থেকে ফোন করতেন আর আমাদের মনে সাহস যোগানোর জন্য কত কথা যে বলতেন, সব সময়ই বলতেন - "তোমার আব্বু ভালো আছে। কোন চিন্তা কোরনা।" রুবাবকে আদরে আদরে ভুলিয়ে রাখতাম। যাতে ওর ছোট্ট মনে কখনো কষ্টের ছোঁয়া না লাগে।

তিনমাস পর ফিরে এলেন আব্বু। সব দেখলাম আগের মতোই। রোজকার মতোই অফিসে যাচ্ছেন, যাচ্ছেন ট্যুরে। এরই মাঝে বদলি হয়ে এলাম চাটগাঁতে-নন্দনকানন, বন পাহাড়ের মনোরম বাংলোয়। ভিতর এবং বাহির সর্বত্র আম্মুর হাতের সযত্ন ছোঁয়ায় সজীব এবং সুন্দর হয়ে উঠলো। সবুজ মাঠে ঢাকা ছোট্ট, একটুকরো বাগান। আম্মুর হবিই বলা যায় বাগান করা। কত যে নাম না জানা গাছের সংগ্রহ তাঁর। গুনে শেষ করা যায় না। আব্বু সব সময় আম্মুকে উৎসাহ দিতেন। আব্বুর একটা অতি প্রিয় জায়গা ছিল। বকুল গাছের ছায়ায় বসে বিকেলে চা খাওয়া। আব্বু রোজ পেপার বা বই পড়তেন ওখানে বসে। আমরাও বসে যেতাম গল্প শোনার লোভে। আব্বু নানা রকম ধাঁধাঁ জিজ্ঞেস করতেন। কখনও রুবাবকে কোলে বসিয়ে Cindarella, Sleeping beauty, Robin hood ইত্যাদি গল্প বলতেন। আব্বুকে তখন আমাদের বয়সীই মনে হোত। কি সুন্দর আর কোমল একটা মন ছিল আব্বুর!

ছুটির দিনে আমাদের নিয়ে আব্বুর আনন্দের সীমা ছিলনা। আব্বুর মাথার পাকাচুল তুলতে লেগে যেতাম। আমি, রুবাব অতি উৎসাহে কাঁচা-পাকা চুল তুলতে থাকতাম, কারণ যে যত বেশী চুল তুলতে পারবে তার তত বেশী টাকা। একটা চুলের জন্য এক টাকা। মাঝে মাঝে আম্মুও আমাদের সাথে যোগ দিতেন। আব্বু বলতেন- "সর্বনাশ! তিন দুগুনে ছয়হাতে তুললেতো মাথাই পরিস্কার হয়ে যাবে।"

আম্মুকে মাঝে মাঝে ছুটি দিয়ে আব্বু রান্না করতে লেগে যেতেন। আব্বুর হাতের রান্না সত্যিই চমৎকার ছিলো। আর আব্বুর হাতের আচারের তেল দিয়ে মাখানো ভাত

এর স্বাদ মনে হয় এখনও মুখে লেগে আছে।

আব্বুর কাছে পড়তে বসাটাও ছিলো একটা বিপুল আনন্দের ব্যাপার। প্রতিটি বিষয়ে আব্বুর জ্ঞানের পরিধি দেখে অবাক হতাম। বাংলা, ইংরেজী, অংক, ভুগোল প্রতিটি বিষয়ই অন্যকে বোঝাতে পারতেন অত্যন্ত সহজ ভাবে। ইতিহাস বিশেষ করে মোঘল ইতিহাসের সন/তারিখ পর্যন্ত তাঁর ঠোঁটস্থ ছিল। আসলেই আব্বুর গুনাবলীর কথা বলে শেষ করা যায় না। এমন একজন অসাধারণ ব্যক্তির সন্তান হতে পেরে আমি গর্বিত।

এর পরের ঘটনা এত দ্রুত ঘটে গেল যে ভয়ে, বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। আব্বুযে ভেতরে ভেতরে এতটা অসুস্থ তা কখনও বুঝতে পারিনি। কারণ অসুস্থতার মাঝেও আব্বু ছিলেন কর্মচঞ্চল, হাসিখুশী। অসুস্থতাকে আড়াল করে রেখে স্বভাব সুলভভাবে আমাদেরকে খুশী রাখবার জন্যই ছিল তাঁর সকল প্রচেষ্টা। কিন্তু ঘুন পোকাযে সবার অলক্ষ্যে বাসা বেঁধেছে ঐ সৌম্য কান্তি শরীরটায় তা বুঝতে পারিনি। এর পর পরই আব্বু ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দাঁত তোলাটা ছিল নিমিত্ত মাত্র। তারই জের টেনে আব্বুকে পৌছাতে হয়েছিল হাসপাতালে।

দেড়মাস খুব কাছ থেকে দেখেছি জীবন-মরন যুদ্ধ। কোনদিন সম্পূর্ণ সুস্থতো কোনদিন এতটাই অসুস্থ যে ডাক্তাররাই অবাক হয়ে যাচেছন। আমার মনে হয় আব্বুর অসীম মনোবলই তাঁকে এতদিন বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলো। যেদিন একটু ভালো লাগতো সেদিন সবাইকে কাছে ডেকে কথা বলতেন। আমাকে আদর করে ''দোলন - মা''বলে ডেকে বলতেন- 'আজকে তোমার হাতে স্যুপ খাবো।' কখনও পড়াশুনার কথা বলতেন, বলতেন রুবাবকে আদর করার কথা। আম্মুর দিকে খেয়াল রাখার কথা।

Ghunati.com

আমি কিছুটা বুঝলেও যেন অনেকটাই বুঝতে পারছিলাম না। কেমন যেন দিশেহারাভাব। বাসায় ফিরে আসতাম এক বুক শূন্যতা নিয়ে। আব্বুর জন্য খতম পড়তাম। নামাজ পড়তাম। রুবাব মাঝে মাঝে ভয় পেত। ওকে বুঝাতাম। আম্মুরা হাসপাতালেই থাকতেন। আমাদের সাথে থাকতেন মেঝ মামী। কত ভাবে যে আমাদের সান্তনা দিতেন!

সেদিন ৫ই জুন, শুক্রবার। আগের দিন (অর্থাৎ ৪ তারিখ) গিয়েছি হাসপাতালে, আব্বু বললেন-''দোলন, রুবাব আজকে তোমরা আমার কাছে থাকো। বাইরে গরমতো AC তে তোমাদের ভালো লাগবে।'' ঘুম ভাঙ্গলো ভোর বেলা। নামাজ পড়লাম। দেখলাম আব্বু জেগেই আছেন। আব্বুর ঘুম হয়নি বলে, আম্মা ও খালারা সারারাত জেগে ছিলেন। আব্বুর মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে ইশারায় ডাকলেন, আমি আস্তে করে আব্বুর বুকে মাথা রাখলাম। দেখলাম তাঁর চোখে পানি। জিজ্ঞেস করলাম কষ্ট হচ্ছে কিনা-ম্লান হেসে বললেন-''এখন আর বেশী কষ্ট নাই, তুমি আমার পাশে বসে একটু কোরআন শরীফ পড়।'' এর মধ্যে হুজুর এলেন, তওবা করালেন। আম্মুর সাথে কথা বললেন। আম্মু বলছিল-''আজতো রজতের জন্মদিন।''

সব স্বাভাবিক কথাবার্তা। কিন্তু ডাক্তার, নার্স বার বার Blood-Presure দেখছিলেন। এর মধ্যে আব্বু আমাদের নাস্তা খেয়ে নিতে বললেন। হঠাৎ করেই আব্বুর শরীরটা খারাপ হয়ে গেল। শ্বাস কষ্ট শুরু হোল। ঘাম হতে লাগলো খুব বেশী। AC চলছিল তারমধ্যেও ঘেমে নেয়ে উঠছিল। আম্মু গা মুছে দিচ্ছেন। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল আব্বুর। ডাক্তার এসে ইঞ্জেকশন দিলেন। সবার মুখ কেমন থমথমে। আম্মুকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল কেউ, ভিড় বাড়ছিল। আমি মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বাতাস করছিলাম তালপাখা দিয়ে, হাতে যত জোর আছে তাই দিয়ে, এতে যদি আব্বুর একটু আরাম হয়! সত্যিই যেন একটু আরাম হোল। শ্বাসকষ্ট একটু একটু করে কমে যাচ্ছে। মনে হোল শান্ত ছেলের মতো আব্বু ঘুমিয়ে গেলেন!! সবশেষ হয়ে গেলো........।

চুনতীর মসজিদের পাশে কবরস্থান। দাদা-দাদীর পায়ের কাছে ছায়া-ঘেরা সবুজ ঘাসের বুকে পরম শান্তিতে শুয়ে আছেন। আমার আব্বুর বিদেশ থেকে পাঠানো সেই ক্যাসেটগুলো আজও আছে আমার কাছে। এখনও মাঝে মাঝে শুনি সেই ক্যাসেটগুলো, আর হারিয়ে যাই সুদুর অতীতে। আবারো খুঁজে ফিরি আমার চিরতরে হারিয়ে যাওয়া আব্বুকে।।

পরম শ্রদ্ধাভাজন মামা

নন্দন

১৯৮৭ সালের কথা, মা আর আমি মামার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। মামার বাসায় যাওয়ার একটা আলাদা আনন্দ সব সময় অনুভব করতাম। সেদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সারাটা দিনই পরম আনন্দেই কাটলো, সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ মামা মাকে বললেন, "বেনু, আগামী কাল তোমার ভাবী আর বাচ্চাদের নিয়ে খাগড়াছড়ি ট্যুরে যাচ্ছি।, তুমিও চলো। মামা আমার মাকে একটু বেশী রকমের ভালোবাসতেন। মা'র আব্দারও মামার কাছে কোন অংশে কম ছিলো না। মা'তো সেই প্রস্তাবে বেজায় খুশী এবং পরদিন সেই সুবাদে মামার সাথে আমাদের খাগড়াছড়ি যাওয়া। এমনি করেই বিভিন্ন সময়ে মামার সাথে ঘুরে বেড়িয়েছি কক্সবাজার, বান্দরবান, কাপ্তাই এ সমস্ত দর্শনীয় জায়গায়। মামার আতিথেয়তা ছিলো অতুলনীয়। মামার সেই আন্তরিক স্নেহময় স্পর্শ আজও একতিল ম্লান হয়নি। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না আমাদের অতি প্রিয়, পরম শ্রদ্ধাভাজন মামা আজ বেঁচে নেই। তাঁর শারিরীক উপস্থিতি হয়তো আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু মামা আছেন আজো আমাদের সবার হৃদয়ের গভীরে।

মামার কর্তব্যনিষ্ঠা, জীবনের প্রতি একাগ্রতা, প্রত্যেকের জন্য তাঁর মায়াময় অনুভূতি এ সব কিছু কে না জানে? উপরন্তু মামার কাছে আমরা যা পেয়েছি তা হল তার স্নেহময় অভিভাবকত্ব। কখনো মামাকে খুব বেশী রেগে উঠতে দেখিনি। অথচ প্রতিটি মুহুর্তে মনে হত, মামা যদি এতটুকু মনোক্ষুন্ন হন, সে ভয়ে খুব বেশী দুষ্টুমি করবার সাহস পেতাম না। তবে একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, ক্ষেত্র বিশেষে মামা আমাদের অনেকটুকুই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। অনেক অভিভাবকের চেয়ে মামার অভিভাবকত্বের মধ্যে যেন একটা বিশেষত্ব ছিলো। জানিনা, আমার অনুভূতিটুকু আমি এখানে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছি কিনা।

মামার পরিবারের সাথে আমাদের ঘণিষ্টতা ছিলো খুব বেশী। ছোট বেলা থেকেই আমাদের মধ্যে একটা আলাদা আকর্ষণ কাজ করতো। যে কোন ছুটির দিনে আমাদের আব্দার হতো মামার বাসায় যাওয়া।

প্রতিটি মানুষের সাংসারিক অথবা চাকুরী জীবনে তাকে কোন না কোন সময় চিন্তিত হতে দেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি মামাকে আমরা দেখেছি সদা হাস্যোজ্জল। যে কোন ক্ষেত্রে তাঁর হাস্যরসাত্মক কথাবার্তা আমাদের যে কোন কারো মনের অস্থিরতাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আনন্দ দিতে পেরেছে। এটাইকি মামার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব নয়?

মামাকে যেমন করে পেয়েছিলাম, আজো তাকে অনুভব করি তেমনই শ্রদ্ধাভরে।

চট্টলার কৃতি-সন্তান ডঃ শফিক আহমদ খান

মোঃ সাহাব উদ্দিন
সিলেট বন বিভাগ।

১৯৬৮ সালে বন মহাবিদ্যালয়ে চাকুরি নেয়ার পর থেকেই "খান সাহেব" নাম শুনে আসছি। ডঃ শফিক আহমদ খান বন গবেষণাগারে "খান সাহেব" নামেই বেশি পরিচিত। এ পরিচিতির বহু স্বাক্ষর তিনি বন গবেষণাগারে রেখে গেছেন। বন গবেষণাগারে তাঁর নিকট-আত্মীয়দের পাশাপাশি অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ডঃ শফিক আহমদ খান ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। "খান সাহেব" বললেই সেই দয়ালু, আদর্শবান, জনদরদী, বিচক্ষণ কর্মকর্তা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ডঃ শফিক খানকেই বুঝাতো। চুনতির ডেপুটি বাড়ির কৃতি-সন্তান ডঃ শফিক আহমদের পদচারণা চট্টগ্রামের বন গবেষণাগারেই বেশি ছিল। তা ছাড়া বন গবেষণাগারের বিভাগীয় প্রধান ও সিলভিকালচার রিসার্চ ডিভিশনের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবনের বেশ ক'টি বছর অতিবাহিত করেন।

ডঃ শফিক আহমদ ছিলেন এক উদার হৃদয়ের অধিকারী। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অনেকে বিপদে-আপদে তাঁর সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হয়। গরীব কর্মচারীদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল ও দয়ালু। ঋণভারে জর্জরিতদের ঋণ পরিশোধে, গরীব কর্মচারীর পরিবার-পরিজনের চিকিৎসায় ও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কন্যার বিবাহে যাঁর সাহায্যের হাত সর্বাগ্রে প্রসারিত হ'ত- তিনি ছিলেন ডঃ শফিক আহম্মদ খান।

hunatr.com
Pioneer in Village based website

বন মহাবিদ্যালয়ে থাকাকালীন আমি ডঃ শফিক আহমদ খানের সাথে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে তিনি প্রায়ই বন মহাবিদ্যালয়ে আসতেন। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে তাঁর ব্যক্তিগত ও অফিসিয়াল কাগজ-পত্র টাইপ করে দেয়ার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। আমি তাঁর মত একজন জ্ঞানী-গুণী ও আদর্শবান ফরেস্ট অফিসারের কাজ করে মনে আনন্দ পেতাম। তাঁর কন্ঠস্বর ছিল গুরুগম্ভীর, যা' তাঁর উপস্থিতির সংকেত বহন করতো।

ডঃ শফিক আহমদ খানের মুখের ভাষা ছিল সাবলীল, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন। ইংরেজী ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতে এমন-সব শব্দ-সম্ভার ব্যবহার করতেন যা' শ্রোতার বুঝতে মোটেই অসুবিধা হতো না। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সংস্পর্শে এসে তিনি বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক কথ্য ভাষা আয়ত্ত করতেও পারদর্শী ছিলেন। সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা তাঁর মুখে শুনে আমি সত্যই অবাক হয়েছিলাম। একদিন বন মহাবিদ্যালয়ের ক্লাস রুম থেকে বেরিয়ে এসে তিনি আমাকে দেখে বললেন- "ওবা, আমারে পানি দিতায় পারবায় নি, আমি আত (হাত) ধুইতাম"। কথা-বার্তায় ডঃ শফিক আহমদ খান বেশ রসিকও ছিলেন। উপরোক্ত স্থানীয় ভাষা ব্যবহার তাঁর রসিকতারই পরিচায়ক।

ডঃ শফিক আহমদ খান সিলেট বন বিভাগে বদলি হয়ে আসার পর তাঁর অধীনে সরাসরি কাজ করার সুযোগ লাভ করি। সিলেটে আসা মাত্র আমি তাঁকে সালাম জানাতে গেলে তিনি আমাকে দেখে বললেন- "ছাম-ওয়ান টোল্ড মি দ্যাট ইউ আর হিয়ার"।

সিলেটের বন কর্মকর্তা হিসেবে তিনি রেখে গেছেন হাজারো স্মৃতি। যে-কেহ তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছে, সে তাঁকে ভুলতে পারে নি। তিনি যেন যাদুমন্ত্রের মতো সকলকে আপন করে নিতে পারতেন। আমার এক আত্মীয়, সিলেট প্রেস ক্লাবের সভাপতি, আমার মাধ্যমে টেলিফোনে ডঃ শফিক আহমদ খানের মৃত্যু-সংবাদে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। প্রায় দু'মিনিট তিনি কোন কথাই বলতে পারেন নি। পরে টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে শুনতে পেলাম- ইন্নালিল্লাহে ....। এরূপ হাজারো সিলেটবাসী তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনে হতবাক্ হয়ে পড়েন। সিলেটের সাধারণ মানুষ ছাড়াও ডঃ শফিক আহমদ খান অনেক বনেদী পরিবারের সাথে পরিচিত ছিলেন। মোট কথা সিলেটের সর্বস্তরের লোকের হৃদয়ে ডঃ শফিক আহমদ খান চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

পরিশেষে, আমি পরম করুণাময় খোদার কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাত ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আমাদের 'মানিকদা'

মরিয়ম রহমান (বেণু)
রুমঘাটা, চট্টগ্রাম।

আমাদের সবার প্রিয় মানুষটি হঠাৎ এভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন কোনদিন ভাবিনি। ডঃ শফিক আহমদ খান। ডাকনাম মানিক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন আমার বড় ভাই। আমরা তাঁকে মানিকদা ডাকতাম। এ নামেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন পারিবারিক মণ্ডলে।

আমার মনে হয় ছোটকাল থেকে তাঁর সবচেয়ে বেশি সাহচর্য লাভ করেছি আমি। ছেলেবেলার খেলার সাথী-সবসময় কাছে কাছে থাকা, খেলাধুলা, পড়াশুনা এমন কি মারপিট সবই তিনি আমার উপর বেশি চালিয়েছেন। মাঝে মাঝে খেলায় মেতে উঠতেন, মাঝে মাঝে শিক্ষাগুরু আবার কখনও বিরূপ হলে হয়ে উঠতেন মারমুখী।

পরিণত বয়সের ধীর-স্থির শফিক খান ছেলেবেলায় অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ-চৈ করা, পুকুরে মাছ ধরা, গুল্‌তি দিয়ে পাখি শিকার করা এ-সবেই পড়াশুনার চেয়ে উৎসাহ ছিলো বেশি। তাঁর নিত্যনূতন উদ্ভাবনীয় খেলাধুলায় অংশ নিতে গিয়ে মায়ের কাছে কত যে মার খেয়েছি হিসেব নেই। দুরন্তপনা ও মস্তিষ্কপ্রসূত খেলা জমাতে তার জুড়ি মেলা ভার। ক্রমে ক্রমে কৈশোরের সেই সোনালী দিনগুলি স্তিমিত হয়ে এলো। আস্তে আস্তে সেই দুরন্ত ছেলেটি পড়াশুনায় মনোযোগী হয়ে উঠলো এবং তারপর থেকে ক্রমেই ধীর-স্থির হয়ে উঠলো। এরপর জীবনের ধাপে ধাপে ক্রমশঃ তাঁর উন্নতি লক্ষণীয় হয়ে উঠলো। নিজে যখন সব ছেড়ে-ছুড়ে পড়াশুনায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো তখন আমাকেও ছাড়তো না। যখন আমি ভালো করে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরচ্চন্দ্রের নামও জানি না, তখন থেকেই আমাকে সে-সব খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং কবিদের বই পড়াতেন জোর করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক কবিতা তাঁর কণ্ঠে অপূর্ব ছন্দে আবৃত্তি করতে শুনেছি। সে-সবের মধ্যে তাঁর প্রিয় কবিতা ছিলো পরশ পাথর, জুতা আবিষ্কার, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ইত্যাদি। স্কুলের পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে অন্যান্য গল্প এবং কবিতার বই পড়ার প্রচণ্ড নেশা ছিলো। সে-সব বই আমাকেও না পড়ালে বোধহয় তাঁর তৃপ্তি হতো না। আমি দু'দণ্ড বই নিয়ে বসে কোন্ ফাঁকে পালিয়ে যেতাম খেলার সাথীদের নিয়ে; তিনি তখন মগ্ন হয়ে পড়তেন আপন ভুবনে। তন্ময় হয়ে যেতেন বই নিয়ে।

জগৎ সংসারের চাকা চিরদিন একতালে ঘোরে না। এক্ষেত্রেও তা-ই হলো। দুরন্ত মানিক ধীর-স্থির হয়ে মেধাবী ছাত্রে পরিণত হয়ে গেলো। এরপর বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশুনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী M.Sc.-তে Bio-Chemistry নিয়ে তিনি First Class First হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। পাশ করার পর তাঁর ইচ্ছে ছিলো Research করার। কিন্তু নানা কারণে এবং আমার বাবার ইচ্ছায় তিনি কর্মজীবনে ঢুকে পড়েন। তাঁর প্রথম চাকুরি

শুরু হয় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে A.C.F. হিসেবে। চট্টগ্রামের নানা জায়গায় তিনি Posted হয়ে দায়িত্ব পালন করে যান এবং সংসারী হোন। এরপর তিনি প্রমোশন পেয়ে D.F.O. পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগে চট্টগ্রামের ফরেস্ট হিল-এ কনজারভেটার পদে উন্নীত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তারপরই তিনি অকস্মাৎ শয্যাগত হয়ে পড়েন। সে কথায় পরে আসছি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি সরকারি দায়িত্ব পালনকালে ট্যুরে যাবার সময় তাঁর পরিবারের সাথে আমিও সঙ্গী হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। ছোটকালে যেমন তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি, বড় হয়ে সংসারী হয়েও তেমনি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। কোথাও হয় তো যাবার প্রোগ্রাম হলো, সেটা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিতেন। তাই প্রায় সময় তাঁর কাছাকাছি থাকার সুযোগ হয়ে যেতো। সরকারি দায়িত্ব পালনকালেও পথে কোথাও হয় তো হল্ট করা হলো সামান্য সময়ের জন্য। ব্যস্, অমনি সেই রাশভারী সরকারী কর্মকর্তাটি হয়ে ওঠতেন অন্য এক মানুষ। হাস্যরসে মাতিয়ে তুলতেন সবাইকে। হঠাৎ আওড়ে ওঠতেন কোন কবিতার দু-চার লাইন, কখনও বলতেন কোন হাসির গল্প কিংবা কৌতুক। চায়ের টেবিল হয়ে ওঠতো গুলজার। তারপর আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কাজের চাপে মাঝে মাঝে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তবুও তাঁর সেই চিরাচরিত হাসিমাখা মুখ কখনও মলিন হতে দেখিনি। অতিথি আপ্যায়ন, গল্প, গুজবে তাঁর ছিলো খুব উৎসাহ। হাজার কাজের চাপেও সে-সবের শৈথিল্য কখনো দেখিনি।

একজন মানুষের সীমিত জীবনে দোষগুণ সবকিছুর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি অসময়ে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন বলেই হয় তো সবকিছুতে একটু বেশি উৎসাহী ছিলেন। হয় তো অসময়ে চলে যাবেন বলেই তাঁর দোষের চাইতে গুণের পরিমাণ ছিলো অনেক বেশি।

Gunati.com
Pioneer in village-based website

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত সুখী ছিলেন। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন সবাইকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। বন্ধু মহলেও তিনি সবার প্রিয় ছিলেন। এমন কি তাঁর অধীনস্থ ছোটখাটো কর্মচারীরাও তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

আমাদের পারিবারিক জীবনে তাঁর অবদানের শেষ নেই। ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে তিনি একসূত্রে গেঁথে রাখতে সব সময় সচেষ্ট থাকতেন। মাঝে মাঝেই বাসায় সবাইকে ডেকে আসর বসাতেন। তাতে গান-বাজনা, গল্প-গুজব, খাওয়া-দাওয়া কিছুই বাদ যেতো না। সঙ্গীতের প্রতিও তাঁর অসীম অনুরাগ ছিলো। ছাত্রজীবনে অনেক জায়গায় গান গেয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। একজন মানুষের জীবনে এতসব গুণের সমাহার খুব কমই দেখা যায়।

এর পরের ইতিহাস অতি করুণ, অভাবনীয় এবং নিষ্ঠুর। সেই সুঠাম সুন্দর দেহের অধিকারী হাসি-খুশি মানুষটি একদিন বিনা মেঘে বজ্রাপাতের মতো আক্রান্ত হলেন ভয়াবহ মরণ-ব্যাধি ক্যানসারে। সেই ব্যাধিই আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেলো তাঁকে। বিধাতার ইচ্ছার হের-ফের হয় না। শুধু আমরা ভীরু হৃদয়ে বারবার তাঁর

দরবারে করুণ আর্তি পেশ করেছি- দয়া কর, প্রভু, দয়া কর। কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়ে গেলো। সবচেয়ে বেশি অবাক হই সেই কালব্যাধি শরীরে থাকাকালীন সময়ে চিকিৎসা চলাকালীন তিনি নিজ কর্তব্য পালন করে গেছেন। এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা বহন করেও নিজেকে সব সময় সক্রিয় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত নিজের দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন যথাসম্ভব। কিন্তু অবশেষে তিন বছর অতিক্রান্ত হবার পর সব চেষ্টা, ডাক্তারদের সব পরিশ্রম সবকিছু ব্যর্থ হয়ে গেলো। আমাদের বুকফাটা আর্তনাদকে পেছনে ফেলে তিনি চলে গেলেন। চরম অসুস্থ অবস্থায় তিনি হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

কিন্তু শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর মনোবল ছিলো অপরিসীম। বড় বড় ডাক্তার পর্যন্ত তাঁর মনোবল দেখে অবাক হয়ে যেতেন। শেষ সময় ভাবীকে একটুও কাছ ছাড়া করতে চাইতেন না এবং বলতেন বাসায় নিয়ে যেতে। তাঁর বিশ্বাস ছিলো তিনি ভালো হয়ে আবার ফিরে আসবেন। কি অসীম মনোবল, ভাবলেও অবাক লাগে। আর একটি কথা তাঁর সম্বন্ধে না বললে অপূর্ণ থেকে যায়। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। জীবনের শেষ শয্যায়ও শুয়ে শুয়ে তিনি নামাজ পড়তেন। প্রাত্যহিক জীবনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা, দান-খয়রাত এগুলি তিনি নিয়মিত করে গেছেন।

অনেক কথা বলা হলো। তবু মনে হচ্ছে কিছুই বলা হয়নি। তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক সামান্য তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। অনেক ব্যথা-বেদনা, অনেক বোবা কান্না আজ লিখতে বসে আমার বুকের ভেতর গুমরে মরছে। কি পেয়েছিলাম তাঁর কাছে? নিজেই জানি না। জানি না কত বড় ঐশ্বর্যশালী হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন যার ভাগ সবাইকে না দিলে তাঁর তৃপ্তি হতো না। মানিক- সেকি সত্যিই সাতরাজার ধন ছিলো? আজ কোথায় কোন্ সুদূরে হারিয়ে গেলো সে সম্পদ? আর আমরা হয়ে গেলাম নিঃস্ব ভিখারি। হৃদয়ের এত কাছাকাছি পেয়েছিলাম যাকে সে আজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কোথায় হারিয়ে গেলো। এখন মহান আল্লাহ্র দরবারে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। শত চেষ্টাতেও যাঁকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, সেই মানুষটি এখনও আমাদের সবার হৃদয়ের মণি-কোঠায় অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। স্মৃতির কুঠুরীতে বন্দী হয়ে থাকবেন আজীবন। সেখান থেকে পালাবে কোথায়? ...

Ghunati.com
Pioneer in village based website

স্মৃতি কথা

এস,এম, সিরাজুল হক
পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আমি ১৯৬৯-এ ইন্টারমিডিয়েটে পড়াকালে ঢাকায় বেইলী রোডে থাকি। বড় ভাই এস, এ, বাতেন ও ডঃ শফিক আহাম্মদ খান তখন বেইলী রোডের কাঠের তৈরি বন বিভাগের অফিসটিতে পাশাপাশি দু'টি কক্ষে বসতেন। কলেজ ছুটির দিনে মাঝে মাঝে আমি ভাইয়ের অফিসে যেতাম এবং একদিন ভাই আমাকে ডঃ শফিক খানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। বাতেন সাহেবের ছোট ভাই হিসেবে এর আগেও বন বিভাগের অনেক কর্মকর্তার সাথে আমার পরিচয় হয়। কিন্তু, ঐদিনের স্বল্প সময়ের আলাপ-পরিচয়ে শফিক খান সাহেবকে অনেক কাছের মানুষ বলে মনে হল এবং তিনি আমার একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে যান। তাঁর কথা বলার ধরন ছিল খুবই চমৎকার। প্রথম আলাপেই বোঝা যায় তিনি একজন বনেদীঘরের সন্তান। এরপর বিভিন্ন সময়ে ভাইয়ের অফিসে গেলেই আমি শফিক ভাইয়ের অফিস কক্ষে যেতাম তাঁর কথা-বার্তা শোনার জন্য। শফিক ভাই তাঁর পরিবার নিয়ে থাকতেন বেইলী রোডে স্কুলের ন্যায় তৈরি টিন-শেডের সর্ব পূর্বের বাসায় এবং আমি থাকতাম তার পরের পশ্চিমের বাসায় ভাইয়ের সাথে।

বাসা দু'টির বারান্দা ছিল একটি হার্ড বোর্ডের পার্টিশনে বিভক্ত। শফিক ভাইয়ের বড় ছেলে রানার বয়স তখন মাত্র সাড়ে তিন বৎসর। প্রায় প্রতিদিন চলে আসত খেলাধুলার জন্য আমাদের বাসায় এবং প্রায়ই কুস্তির ছলে আমার সাথে শক্তি পরীক্ষা করত। বেইলী রোডের বাড়িতে আমি প্রায় দেড় বৎসর থাকাকালে শফিক ভাইকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি। তারপর অনেক দিন তাঁর সাথে আমার তেমন সাক্ষাৎ হয়নি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ভাই অক্সফোর্ডে ট্রেনিংয়ে চলে যান এক বৎসরের জন্য। উনসত্তরের গণ আন্দোলন পেরিয়ে শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। যুদ্ধ পরবর্তীতে আবার ফিরে আসি বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনার্স ও মাস্টার্স করে যোগদান করি চাকুরিতে। বন গবেষণাগারে চাকুরিকালে আবার ডঃ শফিক খানকে পাই সিনিয়র কর্মকর্তা হিসাবে। বন গবেষণাগারে চাকুরিকালে সিলভিকালচার বিভাগে ডঃ শফিক খানের নিরলস প্রচেষ্টায় সিলভিকালচার গবেষণার বিভিন্ন দিকে গতি সঞ্চারিত হয় এবং অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর বেশ কিছু গবেষণাপত্র বের হয়। তারও পরে প্রফেসর আলিমের নেতৃত্বে একদিন সামাজিক বনায়নের উপরে এক ট্যুরে ডঃ শফিক খানের সফরসঙ্গী হই। ঐদিন শুধু তাঁকে দেখা নয়, সামাজিক বনায়নের বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ শুনি তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনায়। ডঃ শফিক যে একজন ভাল বন কর্মকর্তা ছিলেন তা-ই নয়, তিনি একজন আদর্শ শিক্ষকও ছিলেন। বাংলাদেশ বন মহাবিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন সময়ে ক্লাশ নিতেন এবং তিনি ফরেস্ট্রি ইনস্টিটিউটেও ক্লাশ নিয়েছেন। স্বল্প দিনের শিক্ষকতায় মন জয় করে নিয়েছেন অনেক ছাত্রের। পারিবারিক

জীবনেও তিনি ছিলেন একজন সফল পিতা। তিনি তাঁর নিজ আদর্শে সন্তানদের গড়ে তুলেছেন। তাঁরই স্নেহে বড় ছেলে নিয়াজ আহমদ খান (রানা) কৃতিত্বের সাথে এস,এস,সি; এইচ,এস,সি; ডিগ্রী এবং মাস্টার ডিগ্রী পর্যায়ে অত্যন্ত ভাল ফলাফল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন এবং বর্তমানে পিএইচডি'তে বিদেশে পড়াশোনা করছেন। তাঁর সেঝ ছেলে শাহনূর আহমদ খান (রনি)ও এস. এস. সিতে কুমিল্লা বোর্ড থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে।

১৯৯২ সালের মাঝামাঝি সময়ে মৃত্যুর মাত্র ২০-২৫ দিন আগে দেখা হয় নন্দনকাননে বন সংরক্ষকের অফিসে। আমি বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তা ডঃ হিকমত জি. নাসের সহ বন সংরক্ষকের অফিসে যাই। সেদিন প্রাথমিকভাবে বন সংরক্ষকের দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্য তিনি গিয়েছিলেন বন সংরক্ষক জনাব নূরুল ইসলাম হাওলাদারের অফিসে। সেদিনও ডঃ খান হাসিমুখে কুশলাদি জানতে চেয়েছেন আমার ও আমার সহকর্মীদের তথা ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রির সার্বিক অবস্থান প্রসঙ্গে। তারও প্রায় ৩ বৎসর পূর্বে শুনেছি তিনি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং বিদেশে সফলতার সাথে চিকিৎসা শেষে দেশে চাকুরিতে পুনরায় যোগদান করেছেন। বন সংরক্ষকের অফিসে সেদিনও মনে হয়নি তিনি কোন দুরারোগ্য রোগে ভুগছেন। এর কিছুদিন পরই শুনি তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। যাই যাই করেও নানা ঝামেলায় তাঁকে আর দেখতে যাওয়া হয়নি। একদিন সকালে সহকর্মীদের কাছ থেকে শুনতে পাই পূর্বের রাতে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ টিভিতে ঘোষণা করা হয়েছে। শেষবারের মত তাঁকে দেখতে যেতে না পারায় আজও নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে।

Ghurati.com
Pioneer in village based website

শফিক ভাই আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু, তাঁর কর্মজীবন এবং পারিবারিক জীবন- যা আমি দেখেছি, আদর্শ হয়ে থাকবে সকলের জন্য চিরদিন। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

সবশেষে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মরহুম ডঃ শফিক আহামদ খানের সুযোগ্য গৃহিনীর নিকট, আমাকে তাঁর জীবনের কিছু ঘটনা লেখার সুযোগ দেয়ার জন্য।

স্মৃতি অম্লান

এ,এইচ,এম,মঞ্জুরুল করিম
বন সংরক্ষক, ঢাকা।

১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাস। অর্থাৎ প্রায় ২৬ বছর পূর্বে মরহুম ডঃ শফিক আহমদ খানের সান্নিধ্যে আসি প্রথম। ঘটনার পূর্বাপর ব্যাখ্যা হল যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পাকিস্তান ফরেষ্ট কলেজ, পেশওয়ারে দু'বছর মেয়াদী ইষ্ট পাকিস্তান সিনিয়র ফরেষ্ট সার্ভিস পদে নিয়োগ পূর্বে স্টাইপেন্ডারী ষ্টুডেন্ট হিসাবে শারিরীক যোগ্যতার জন্য চূড়ান্ত নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীদের এনডিউর‌্যান্স টেস্ট করা। খুব সংক্ষিপ্ত নোটিশে ডঃ খানের সংগে যোগাযোগ করতে হয় উল্লেখিত ব্যাপারে। তিনি তখন সম্ভবতঃ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন-সম্প্রসারণ দক্ষিণ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত। বন-অধিদপ্তরকে পি, এস, সি, কর্তৃক সাময়িকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের এই টেষ্ট পরিচালনা করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। আর সম্ভবতঃ ডঃ খানকে বন-অধিদপ্তর ইহার যাবতীয় ব্যবস্থা করার ভার অর্পণ করে থাকবে। এই সুবাদে শরতের এক শুভ সকালে ডঃ খানের সংগে প্রথম সাক্ষাৎ হল তার বেইলী রোডস্থ অফিসে। পূর্বে সাক্ষাৎ না হলেও-প্রার্থী নির্বাচনের জন্য কমিশন ও অধিদপ্তরের মধ্যে পত্র যোগাযোগ হতে তিনি আমাদেরকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে চিনতে বিলম্ব না করে তার অফিসে স্বাগত জানান। ক্লাস ফ্রেন্ড জুনায়েদ কবির চৌধুরী (পরবর্তীতে সহকর্মী) ও আমি নিজ নিজ পরিচয় ব্যক্ত করে আমাদের করণীয় ডঃ খানের নিকট জানতে চাইলে তিনি প্রথমেই আমাদেরকে সিনিয়র ফরেষ্ট সার্ভিসের সদস্য হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে যাচ্ছি বিধায় "অভিনন্দন" জানান। সৌম্য মূর্তি, সদালাপী, কার্টিয়াস ও বন্ধু সুলভ আচরণে আমরা দু'জনেই বিমোহিত হই। ইতিমধ্যে চা-পান হয়ে গেছে এক দফা। অতঃপর এনডিউর‌্যান্স টেষ্ট ব্যাপারে তিনি নির্ধারিত দিনে সকাল ৮টার দিকে মহাখালী অফিসে উপস্থিত থাকার উপদেশ দেন। উক্ত দিনে উপস্থিত হলে তিনি আমাদেরকে তার সরকারী গাড়ীতে করে শালনা বন বিশ্রামাগারে নিয়ে যান। আনুমানিক সকাল ১০টায় শালনা হতে শুরু হয় আমাদের পায়ে হাটা এনডিউর‌্যান্স টেষ্ট। রাজেন্দ্রপুর বন বিশ্রামাগার পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে রেষ্ট হাউসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় সেখান হতে ফিরতি হাটা শুরু হয়। যাতায়াতের সময় ডঃ খান তার জীপে আমাদের পিছু পিছু সার্বক্ষণিকভাবে অনুসরণ করেন। এই দীর্ঘ পথ হাটতে গিয়ে প্রার্থীদের কোন প্রকার সমস্যা হয় কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ করার জন্য। শালনা বন বিশ্রামাগারে ফিরে আসার পর বেশ কিছু সময় তার সংগে কাটানোর সুযোগ পাওয়া গেল আবার। সদালাপী ডঃ খান তখন তার পেশওয়ারে ট্রেনিং কালের স্মৃতি হতে সেদিন অনেক গল্পই বলেছিলেন আমাদেরকে- তার সংগে উপদেশমালা। ট্রেনিং কালীন সময়ে কিভাবে কি করা দরকার ইত্যাদি বিষয়ে পেশওয়ারে যাত্রার পূর্বে ডঃ খানের সংগে আর একবার তার কার্যালয়ে গিয়ে দেখা করলে তিনি সহাস্যে আমাদেরকে কনগ্রাচুলেশন জানান। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে চলে যাই পেশওয়ারে। তারপর পেশওয়ারে

Ghurani.com
Pioneer in village-based website

যথারীতিভাবে প্রশিক্ষণ শেষে আবার ফিরে আসি পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে। তারপর রেঞ্জ ট্রেনিংয়ে ঢাকা বন বিভাগের রাজেন্দ্রপুর রেঞ্জে পোষ্টিং হয় আমার। এবং সেই সুবাদে তখন আবার ডঃ খানের সংগে দেখা হয়। মাঝে মাঝেই তিনি আসতেন রাজেন্দ্রপুর। বন বিশ্রামাগারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে ফিরে যেতেন ঢাকায়। মনে পড়ে প্রথম দিন রাজেন্দ্রপুর রেষ্ট হাউজে আলাপ প্রসংগে তিনি বলেন, মঞ্জুর "ইউ আর লাকি"। ঢাকায় অদুরবর্তী রাজেন্দ্রপুরের মত রেঞ্জে (রেঞ্জ) ট্রেনিংয়ে নিয়োজিত হওয়াতে তিনি অনুরূপ মন্তব্য করে জানান যে তার (ডঃ খানের) রেঞ্জ ট্রেনিং হয়েছিল চট্টগ্রাম বন বিভাগের অধীন নারায়নহাট রেঞ্জে ১৯৬৩ সালে। তখনকার দিনে নারায়ন হাটের মত জায়গাতে যেতে হলে নাকি বাই সাইকেলই ছিল একমাত্র ভরসা নতুবা "পায়দল"। আমি চট্টগ্রাম বন বিভাগের দায়িত্বে থাকাকালীন সময় (১৯৯১ এর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী) তিনি আলাপ প্রসংগে জানতে চান এখন নারায়নহাট রেঞ্জের যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কে। তাকে জানাই যে ফটিকছড়ি হয়ে জীপে সরাসরি নারায়ন হাট রেঞ্জ হয়ে সোজা দাতমারা হিঁয়াকো হয়ে করের হাটে যাওয়া যায়। তখন তিনি সহাস্যে জানান "যদি আমি সাইকিলিং না জানতাম- তবে হয়ত বা রেঞ্জ ট্রেনিংয়ের সময় ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতে।" লক্ষ্য করেছি যখনই তিনি রাজেন্দ্রপুরের দিকে যেতেন তখন তার সংগে থাকত পয়েন্ট টু টু বোরের 'ডায়না' রাইফেলটি। রাজেন্দ্রপুরে আমার সংগে ফ্যামেলি থাকার কথা শুনে তিনি জানান যে, হয়তবা মাঝে মধ্যে আমাদেকে বিরক্ত করতে পারেন। আমি তাকে তখন আমরা বিরক্ত হলে খুশী হব বলে জানালে তিনি একদিন আমার বাসায় হঠাৎ করে দ্বিপ্রহারিক মেহমান হন। ঢাকার মত এমিনিটিজ পূর্ণ স্থান আমার কর্মস্থল রাজেন্দ্রপুর তখন ছিল না। ছোট একটি রেল ষ্টেশন সংলগ্ন বিদ্যুৎ বিহীন রেঞ্জ অফিসারের কোয়াটারে সরকারী একটি শাল কাঠের টেবিল এবং চারটি হাতওয়ালা শাল কাঠের তৈরী ভারী চেয়ার যাহা ডাইনিং টেবিল হিসাবে ব্যবহার করা হত। একজন সিনিয়র সহকর্মী এই অবস্থাতে আমাদের সঙ্গে খাবেন বলে বেশ খুশী লাগছিল। খাবার শেষে তাকে বললাম স্যার তেমন কিছু যোগাড় করা সম্ভব হয়নি, উত্তরে তিনি জানালেন মঞ্জুর "কি খাওয়ালেন সেটা বড় কথা নয় তার চেয়ে কতটুকু আন্তরিকতা ছিল সেটাই বড় কথা"। তারপর তিনি জানতে চান যে আমাদের কোন সমস্যা আছে কিনা। আমি জানালাম স্যার চাকুরীগত কোন সমস্যা নাই, তবে আমাদের কিছু জংলী মেহমান আছে- যাদের উপদ্রব দিন দিন বেড়েই চলছে। এদের একটু শায়েস্তা করতে হয়- কেননা এইসব কাঠ বিড়ালী মেহমানরা আধা ভাংগা রান্না ঘরে কোন কিছু খাবার জিনিষ রাখতে দেয় না। দলবেঁধে ওতপেতে এরা দেখে কখন রান্নার কাজ শেষ হবে- তার সংগে একটু সুযোগ- বাস্ তখনই পাতিলের ঢাকনা ফেলে কিছু খাওয়া কিছু ছিটকানো চলবে কিছুক্ষণ। তখন ডঃ খান জানান এই কোন সমস্যা নয়- তারপর বাস এক শর্টে তিন তিনটি মেহমান ধরাশায়ী হয় আর যারা পালিয়ে গেল তারা নিকটস্থ গজারী গাছের উঁচু ডালে উঠে লেজ ফুলিয়ে হয়তো বা আমার ওয়াইফকে জানিয়ে (শাসিয়ে?) দিল। "আমাদের যত মারবে আমরা ততই বাড়ব এবং উপদ্রব করব"। তাদের কথা পুরাপুরি সত্যি না হলেও রেঞ্জ কোয়ার্টারে

বসবাসের শেষ সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭১ সালের মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে তাদের বর্গীয় ষ্টাইলের হামলা হতে রেহাই পাওয়া যায়নি। তারপর হতে কাঠ বিড়ালী এবং তাদের লেজ ফুলানো চেহারা দেখলে সংগে সংগে মনে পড়ত ডঃ খানের কথা এবং সেই সংগে রেঞ্জ ট্রেনিংয়ের ফেলে আসা সোনালী দিনগুলির কথা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ মার্চের মাঝামাঝি সময়ে রাজেন্দ্রপুর হতে সিলেটের জুড়ীতে বদলী হলে গেলে এবং তথা হতে ভারতে চলে যাওয়ার পর ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ডঃ খানের সংগে আর দেখা হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জুরী হতে বদলী হয়ে কক্সবাজার বন বিভাগে কিছুদিন কাজ করার পর ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম বন বিভাগে বদলী হয়ে আসলে ডঃ খানের সংগে পুনরায় দেখা হয়। তখন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা। চট্টগ্রাম বন বিভাগের মত বন বিভাগে কর্মরত থাকলে স্বভাবতই অন্যান্য বন বিভাগ হতে আগত বনজদ্রব্য চেকিং এর উপর খবরদারি এমনিতেই আসে এবং এ রকম একটি উপলক্ষ্যেই কালুরঘাট ব্রিজের উজানে কাপ্তাই হতে আগত একটি কাঠের চালী যৌথভাবে চেকিং এর সময় আবার ডঃ খানের সংগে দেখা হলে যুদ্ধকালীন সময়ে আমাদের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়। সেই সংগে চট্টগ্রাম এলাকার ভেলা কাঠের (রাফট টিম্বার) চেকিং এর অভিজ্ঞতা ও লাভ করলাম। অতঃপর ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে পাঁচলাইশে যে বাসায় আমি থাকতাম সেটি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে ফরেষ্ট হীলে চলে আসি। তখন তিনি রাংগামাটি হতে এফ. আর. আইতে বদলী হয়ে আসেন। ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে বদলীয় হয়ে চট্টগ্রাম হতে কক্সবাজারে চলে যাই। ডঃ খান ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম উপকূলীয় বন বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত হন এবং এই সুবাদে তাকে কক্সবাজারে প্রায় ট্যুরে যেতে হত। সম্ভবতঃ ১৯৭৬ই সনের অক্টোবর মাসে একদিন তিনি তার মহেশখালী ট্যুর শেষে আমার বাসায় আসেন এবং বিকালের দিকে শিকার বাতিক ডঃ খানের সংগে টেকনাফের পথে তাঁর সংগী হতে হয়। তখন আমি কক্সবাজার দক্ষিণ মহকুমার দায়িত্বে ছিলাম। হ্নীলা পৌছতে পৌছতে দিনমণি তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে এবং তার লাল আভা নাফ নদীর জল রাশির উপর এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছে, এমনি গোধূলী লগ্নে আমরা নদীর কুলে পৌছি। নাফ নদী ও নদীর তীরে যেসব পক্ষীকুল তাদের খাদ্য অন্বেষণে আসে তারা সম্ভবতঃ এই সময়ে দিনের আহার শেষে নিজ নিজ নীড়ে ফিরে যাওয়ায় তেমন কোন পাখী দেখা গেল না। ডঃ খান বললেন মঞ্জুর পড়ন্ত বিকেলের এমন পরিবেশে পাখী শিকার এর চেয়ে কবিতা লিখার আনন্দই বেশী। তাই মনে হয় কিছু লিখতে পারলে কিছুটা পরিশ্রম স্বার্থক হত। উল্লেখ্য ডঃ খান লিখতেন ও ভাল। অতঃপর তিনি জানান যে আমার অতিথি হয়ে রাতটি হ্নীলা রেষ্ট হাউজে কাটাবেন। আমি স্বাগত জানিয়ে তাকে সহ হ্নীলা রেষ্ট হাউজে গেলাম। বর্তমানে অবসর জীবন যাপনরত জনাব আলিমুদ্দীন সহকারী বন সংরক্ষক, তখন হ্নীলা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার। সম্ভবতঃ ডঃ খানের অধীনে অন্য কোথাও চাকুরী করে থাকবেন- তাই পূর্বতন বসকে পেয়ে মিঃ আলিমুদ্দীন বেশ খুশী হন। হ্নীলার এক কামড়া বিশিষ্ট বন বিশ্রামাগারে অবস্থানের সময় ডঃ খান তার চাকুরী জীবনের অভিজ্ঞতা বলেছিলেন। বন,

বনভূমি হ্রাস, বনের তৎকালীন সময়ের অবস্থা, বিশ্বব্যাপী বন ধ্বংস ইত্যাদি ব্যাপারেই আলাপ করছিলেন তিনি। সে রাতের একান্ত পরিবেশে তাকে জানার সুযোগ হয়েছিল যে ডঃ শফিক আহমদ খান শুধু বন কর্মকর্তা হিসাবেই নয়, একজন মানুষ হিসাবে ও ছিলেন মহৎ প্রাণের। আজ এত বছর পরও মনের মুকুরে সেই স্মৃতি ভাস্বর হয়ে আছে। যা হোক পরদিন প্রত্যুষে আবার সেই নাফ নদীর কিনারে- পাখী শিকার অন্বেষণে। তার লক্ষ্য ছিল অভ্রষ্ট। তাই এক গুলিতেই প্রায় আধা ডজনের মত শিকার সংগৃহীত হল। সেখান হতে কক্সবাজার ফেরার পালা। বাসায় ফিরে দ্বিপ্রহরের আহার শেষে তিনি চট্টগ্রাম ফিরে আসেন। তারপর তিনি বিদেশ চলে যান উচ্চ শিক্ষার জন্য এবং ডি, এস, সি, ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলভিকালচারাল রিসার্চ ডিভিশনের দায়িত্বে নিয়োজিত হন এবং এই সুযোগে তাকে দিনাজপুর সিলভিকালচারাল রিসার্চ ষ্টেশন চড়কাইয়ে ট্যুরে যেতে হত এবং তখন আমি দিনাজপুরের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত। দিনাজপুর সফরের সময় তার সফর সংগী হতে হয়েছিল একাধিকবার। তিনি তার রিসার্চ ষ্টেশন পরিদর্শন করেছেন- তার সংগে কমিউনিটি ফরেষ্ট্রীর সাফল্যজনক কাজ কর্ম দেখে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাংগাইলের বন ভূমিতে অনুরূপ কার্য্যক্রমের যে আশাবাদ তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেদিন তারই পরবর্তী বিস্তৃতি আজ সারাদেশ ব্যাপী "থানা বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্পের" বাস্তবায়ন। দেশের উত্তরাঞ্চলের মরু প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ঘটনাতে তিনি তার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ও প্রকাশ করতেন যখনই তিনি দিনাজপুরে সফরে যেতেন। তার এই উদ্বেগ নিঃসন্দেহে দেশ প্রেমিকতারই একটা মহৎ দৃষ্টান্ত। ১৯৮৫ইং সালের নভেম্বরে আমার আব্বার মৃত্যুর সময় ডঃ খান দিনাজপুরে সফরে গেলে তখন তার সফরসংগী হওয়া সম্ভবপর হয়নি। পরবর্তীতে তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হলে আমার আব্বার মৃত্যুতে তার যে অনুভূতি তিনি প্রকাশ করেছিলেন সেদিন তা আমার জীবনের স্মরণীয় হয়ে আছে এখনও। এই ঘটনা ইহাই প্রমান করে যে, একজন সহকর্মীর প্রতিই শুধু তার সহমর্মিতা নয় তার (সহকর্মীর) পরিবারের প্রতি ও তার সমমর্মিতা ছিল একই রকম। দিনাজপুর শহরের অদূরে উত্তরাঞ্চলের বিখ্যাত দীঘি রাম সাগরের টীলায় অবস্থিত রেষ্ট হাউজে তার সফরকালীন সময়ে অবস্থানের সময় রাম সাগর দীঘিটিকে কেন্দ্র করে একটি পর্যটন শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা বিষয়ে তিনি তার বিদেশে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতেন এরকম একটি দিঘীকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে উন্নত করতে পারলে রিক্রিয়েশনমনা জনগণ কিছুটা হলেও তাদের চিত্ত বিনোদনের সুযোগ পেত অপরদিকে সরকার ও রাজস্ব আয়ে লাভবান হতো।

তারপর বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গেছে। তাকে তার জীবনের শেষ দিনগুলিতে পেয়েছিলাম অতি নিকট প্রতিবেশী হিসাবে। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন ব্যবহারিক বিভাগে তিনি যোগদান করেন ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। আমি তখন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম। টুইন বাংলোয় আমাদের বসবাস। প্রায় দু'যুগ পূর্ব এমনকি চাকুরীতে প্রবেশের পূর্ব হতে যার সংগে বিভিন্ন জাগায় দেখা তাকে অতি নিকটের মানুষ হিসাবে পেয়ে সেদিন বেশ আনন্দিত হয়েছিলাম আমি ও আমার পরিবার। চট্টগ্রাম

বন বিভাগের মত একটা সমস্যাসংকুল বন বিভাগে বেশী ব্যস্ত থাকতে হত-তাই তার সংগে দু'এক দিন দেখা না হলে তিনিই আমার অনুপস্থিতিতে আমার পরিবার ও বাচ্চাদের বিষয়ে খোঁজ খবর নিতেন। নিকটের এমন একজন ভাল সহকর্মী প্রতিবেশী থাকায় বনবাদাড়ে পরিদর্শনের সময় আমিও হতে পেরেছিলাম নিশ্চিত। মনে পড়ে বাংলা ১৩৯৮ সালের ১লা বৈশাখ। তিনি তার আদরের ছোট ছেলে রুবাব ও মেয়ে দোলাকে সংগে নিয়ে রজনী গন্ধার ষ্টীকসহ কোন সকালে উঠে বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে আমাদের বাসায় আসেন এবং আমার পরিবারের সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন- যা ছিল বাংগালী জাতীয়তা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতি তার অনুরাগ ও ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিলের রাতের ঘূর্ণিঝড়- যা ছিল স্মরণকালের ভয়াবহতম দুর্যোগ। এই দুর্যোগের পরদিন যখন চট্টগ্রাম ছিল দেশ হতে বিচ্ছিন্ন একটি নগরী এবং বন পাহাড়ের গাছপালা ধ্বস, বিদ্যুতের তার, পানির লাইন বিচ্ছিন্ন- তখন দেখছি ডঃ খানের উদ্বেগ। ব্যক্তিগতভাবে বন পাহাড়ের বসবাসরত সকল কর্মচারীর খোঁজ খবর নিয়েছেন তিনি এবং উপকূলীয় এলাকার কর্মচারীদের জন্য তার উৎকন্ঠার সীমা ছিল না। তার এই সহমর্মিতা এমনকি তার স্বজনদের চেয়ে কোন অংশে কম বলে মনে হয়নি সেদিন। অতঃপর ১৯৯২ সালে এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখে তিনি বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দুঃভার্গ্যবশতঃ তার সংগে কাজ করার সুযোগ আর বেশীদিন হল না। কার্য্যভার গ্রহণের অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। খুলসীস্থ হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে "আজ কেমন আছেন স্যার"? একথা জিজ্ঞাসা করার আগেই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন মঞ্জুর "ছেলের পরীক্ষা কেমন হল? মেয়ে কেমন আছে?" উল্লেখ্য তখন আমার ছেলের এস, এস, সি পরীক্ষা চলছিল। আর মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতে ক্যাম্পাসের অশান্ত পরিস্থিতির জন্য। দিন দিন তার অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। এমতাবস্থায়ও দেখেছি হাসপাতালে দর্শনার্থীদের সংগে তার অমায়িক ব্যবহার এবং প্রাণখোলা আলাপ। অবশেষে ৫ই জুন রোজ শুক্রবার বেলা ১২টার কিছুক্ষণ পরে ডঃ খান মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেন (ইন্না----রাজেউন)। তিনি আজ আর নেই। কালের অমোঘ বিধানে তিনি হারিয়ে গেছেন অনন্তকালের সংগে। কিন্তু আছে তার আদর্শ- যা অনাগত দিনগুলিতে বন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকবে।

তার সমাধিস্থল চুনতিতে গেছি। সংগে ছিল তার অনুজ জুনু ভাই। জুনু ভাই আলাপ প্রসংগে বলছিলেন "মানিক ভাইকে (ডঃ খানের ডাক নাম) আব্বা-আম্মা আমাদের সকল ভাই-বোনদের চেয়ে বেশী ভাল বাসতেন"। তাই প্রয়াত পিতা-মাতা তাদের এই আদরের ছেলেটিকে আদর জানানোর জন্যই হয়ত বা তাদের কাছে ডেকে নিয়েছেন- তাদের সকল সন্তানদের আগেই। আর তাই ডঃ শফিক আহমদ খান পিতা-মাতার সংগে একই স্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন চুনতির ছায়া সুশীতল গ্রামের টীলাতে। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন। আমিন।

স্মৃতির অবগাহনে

মিসেস নূরজাহান শফিক

'একটি ভাঙ্গা বীণায় সুর তুলতে হবে'-আমাকে বলা এ কথাটি ছিল আমার বাবার আদেশ। এ আদেশ শিরোধার্য্য করে আমাদের বিবাহিত জীবনের যাত্রা শুরু। তারপর থেকে এই ১৮ বছরের জীবন পরিক্রমায় জমেছে অযুত ঘটনা, জমেছে নিযুত অনুভূতির সুখময় স্মৃতি।

স্মৃতি কথা লিখবার জন্য আমিই উদ্যোগী হয়েছিলাম। অথচ আজ লিখতে বসে কলম থেমে যায়, আর আমি হারিয়ে যাই ভালোবাসায় অভিসিক্ত আশ্চর্য এক সুন্দর অতীতে।

চমৎকার সব দৃশ্যপট বদলাচ্ছে, সরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে না। নানা রং এ উজ্জ্বল, নানা বর্ণে বর্ণীল।

কোনটা ভোরের সূর্য ওঠার সময়কার মত টকটকে লাল.........যেন তাঁর মনের আবেগ ছোপাণ রং।

কোনটা আকাশ নীল..........তাঁর ঔদার্য্য যেন আকাশের বিশালতার সাথে তুলনীয়।

কোনটা সবুজ..........অরণ্যকে ভালবেসে, মনজুড়ে চির সবুজের চপল-চাঞ্চল্য।

কোনটা হলুদ..........কর্মে, মননে, অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক।

আবার কোনটা ধুসর..........জীবনের পড়ন্ত বেলায় শ্রান্ত, ক্লান্ত এক বিষন্ন পুরুষের।

জীবন জুড়ে মানুষ প্রতি মুহূর্তে যা কিছু পায় ও হারায়, সবই আশ্রয় পায় মনের গভীরে। সেই সুন্দর অবচেতনকে তুলে আনারই এক আবেগ উপদ্রুত অবলম্বন হল- স্মৃতিচারণ।

যাকে নিয়ে ভাবি, একান্ত যার কথা মনে করে ব্যাকুল হই, সেই সব একান্ত ভাবনাকে কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলার সাধ থাকলেও সাধ্য যে নেই আমার। বিপুল ঘটনাকীর্ণ নিজের জীবনের জলছবি আঁকা কঠিন, তার চেয়েও সুকঠিন সেই বিস্তীর্ণ বলয়কে সংক্ষিপ্ত করা।

যে মানুষটি আমার জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন, তিনি আমার পরম আরাধ্য, পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত স্বামী ডঃ শফিক আহমদ খান। ৭ ভাই ও ৬ বোনের মধ্যে উনি হলেন সপ্তম, অর্থাৎ একেবারে সবার মধ্যমণি ছিলেন। ডাক নাম 'মানিক' (একান্তে ডাকতাম 'মানিক্য' বলে)। মনিকাঞ্চন যোগে যেমন তৈরী হয় মূল্যবান অলংকার তেমনি তাঁর মধ্যে ছিল নানান চারিত্রিক গুণাবলীর সমাহার। তাই 'মানিক' নামটি যথার্থই মনে হয়েছে সবসময়, সবার কাছে।

উনি ছিলেন উন্নত রুচির আভিজাত্যে নন্দিত এক সুন্দর পুরুষ। সদাহাস্যময়, কৌতুকপ্রিয়, বন্ধুবৎসল এবং মজলিশি। অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন নীরবে নিরলস কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। তার স্বীকৃতি তিনি পেয়েছিলেন মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে। মাধুর্য্যমন্ডিত স্বভাব, শান্তস্নিগ্ধ সান্নিধ্যের পরশ, সহজে অন্যদের আপ্লুত করেছে। ছোট বড় নির্বিশেষে সবাই ছিল তাঁর অনুরক্ত। যে কোন পরিস্থিতিতে তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতায় সবাই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে যেত। বক্তৃতাই হোক অথবা ঘরোয়া কোন অনুষ্ঠানের আয়োজনেই হোক, রসোত্তীর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর আপত্য স্নেহ ভালবাসা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিলেন তাঁর একান্ত কাছের জনদের। অসীম জনদরদী মানুষটি পর্যাপ্তভাবে বেঁচে থাকার বিশ্বাসী ছিলেন। আর তাই জীবনের দুঃখ, কষ্ট, অসুন্দরকে অবলীলায় অতিক্রম করে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন এক অনাবিল আনন্দ।

তিনি কোন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। ছিলেন না কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি। সর্বৈব ভাবে একজন 'গুণী' ব্যক্তিত্বকে সম্মান প্রদর্শন এবং মূল্যায়ন করার মধ্য দিয়ে আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর মৃত্যুর পর লেখা আহবান করায় সহকর্মী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে পেয়েছি বিপুল সাড়া। তাই সচেষ্ট হয়েছি এ সংকলন প্রকাশনায়। স্মৃতিচারণের মাধ্যমে যাঁরা তাঁকে ভালবেসে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, মূল্যায়ন করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সবার কাছে অশেষ ঋণী থাকলাম।

Ghunati.com

সময়ের প্রবাহ মনের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গ তুলছে। আমি জানি, কোন মৃত্যুই অন্য কারো জীবনকে বিধ্বস্ত করে না। বেদনা ভুলতে গিয়ে আরও বেদনার্ত হচ্ছি।

সন্তানদের ঘিরে সংসারের আবর্তন থেমে থাকে না। সময় চলতে থাকে তার আপন গতিতে। পার্থক্য শুধু এই, যে জীবনটা ছিল ভারশূন্য তা আজ ভারবাহী মনে হয়। ভারশূন্য এই অর্থে-যে জীবনটা পেরিয়ে এলাম সেখানে কোন সংশয় ছিল না, কপটতা ছিল না, ছিল না কোন অভাববোধ। নিস্তরঙ্গ জলে পাল তোলা নৌকো যেমন তর তর করে নিশ্চিন্তে বয়ে চলে, তেমনি স্বামী, সন্তানদের নিয়ে সংসারের ছোট্ট ভারহীন নৌকোখানা এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভেসে যাচ্ছিল।

সন্তানদের জন্য ছিল তাঁর অপরিসীম স্নেহ, আদর--তেমনি ওরাও ছিল বাবা-অন্তঃপ্রাণ। বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বড় ছেলে নিয়াজ আহমদ খান (রানা) ছাত্র জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজ। বর্তমানে কমনওয়েলথ স্কলারশীপ নিয়ে 'ওয়েলস' এর সোয়ানসীতে পি.এইচ.ডি অধ্যয়নরত। মেঝ ছেলে নাফিস আহমদ খান (রজত) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীতে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। বর্তমানে সে সাব লেফটেনেন্ট পদে নিয়োজিত। তৃতীয় ছেলে শাহনূর আহমদ খান (রনী) ১৯৯৮ সালে কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এস, এস, সি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগ হতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে সিলেট ক্যাডেট কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। চতুর্থ এবং একমাত্র মেয়ে রেহ্নূমা

খান (দোলা) ১৯৯৪ সনে এস, এস, সিতে স্টার মার্ক পেয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। আদর করে মেয়ের নাম রেখেছিলেন 'দোলা'। বাবার মনে খুশীর দোলা লেগেছিল সেদিন। পঞ্চম ছেলে জহীদ আদনান খান (রুবাব) সেন্টমেরীস স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র। রুবাব ছিল ওর বাবার নয়নের মনি। বলতেন বুড়ো বয়সে ও হবে তাঁর হাতের লাঠি। ছোট্ট বলে ওর আবদার প্রাধান্য পেত বেশী। বাইরে বের হলেই এটা সেটা কিনে আনতেন ওর জন্য। আমি মাঝে মধ্যে রাগ করলে, বলতেন ঃ

'শিশু যদি তুষ্ট হয়
তায় মিটে যায়-
ব্রজের মাখন চোরা
গোপালের ক্ষুধা'।

বাচ্চাদের অসুখ-বিসুখ হলে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়তেন। একবার স্থানীয় একটি ক্লিনিকে 'রুবাবের খত্না করানো হল। জ্ঞান ফিরে আসার পর ওর অস্থিরতা দেখে উনি রীতিমত কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ডাক্তার বললেন এটা স্বাভাবিক। উনি ওখানেই জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়লেন, দোয়া করলেন ছেলের আরোগ্যের জন্য। ডাক্তার সাহেব হেসে বললেন-

Any body can be a 'father',
but it takes some one
special
to be a 'dad'.

তাঁর খুব পছন্দের ছিল আমাদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়া। চাকুরীর সুবাদে গিয়েছি নতুন নতুন জায়গায়। দেখেছি বাংলাদেশের গভীর অরণ্য, নদী, সমুদ্র-পাহাড়। প্রকৃতির রূপ নিমেষেই রূপময় হয়ে যেত যখন তাঁর মত একজন বন্ধু, ফিলসফার এবং গাইড সঙ্গে থাকতো। বয়সের ব্যবধান যেত ঘুঁচে। প্রকৃতির মতোই প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা অন্তর, শিশুর সরলতার সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেত।

শুনেছি রসিক জনেরা ভোজন রসিকও হন বটে! ভাল রান্না খাওয়ার লোভে তাই কিনে দিয়েছিলেন 'রান্না খাদ্য পুষ্টি'-বইখানা। কিন্তু আমি রান্নায় দ্রৌপদী কখনই নই, অগত্যা বন্ধের দিনে বাচ্চাদের নিয়ে নিজেই লেগে যেতেন রান্নায়, পিকনিকের আনন্দ পেত ওরা।

একাকিত্ব ওনাকে ভীষণ কষ্ট দিত। চাকুরীর খাতিরে কয়েকবারই তাঁকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় একাই থাকতে হয়েছে। বিভিন্ন সেমিনারে যোগ দিতে বিদেশেও গিয়েছেন কয়েকবার। তার মধ্যে ব্যাংকক, শ্রীলংকা, ভারত, পাকিস্তান, কেনিয়া (আফ্রিকা), লন্ডন, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ইত্যাদি। তখন ভীষণ হোমসীক হয়ে পড়তেন। ফোনে খোঁজ খবর নিতেন। কিন্তু রোজ রোজ কি চিঠি লিখা সম্ভব? হ্যাঁ, ওনার পক্ষে তাও সম্ভব হয়েছিল।! বিয়ের ৩ বছর পর যুগোশ্লাভিয়া গিয়েছিলেন পি.এইচ.ডি করতে। একটানা দীর্ঘ ৩ বছর সেখানে ছিলেন। সেই দুঃসহ মুহূর্তগুলোতে

ওনার লেখা চিঠিগুলো আমাকে প্রেরণা দিয়েছে, মুছে দিয়েছে চোখের জল। সেসব এক একটা চিঠি ছিল প্রেমের আলোকে উজ্জ্বল ও বিধুর।

কাব্য ও সাহিত্যে তাঁর পান্ডিত্য ঈর্ষণীয়। সেই চিঠিগুলো বুদ্ধদেব গুহের মতো কোন ঔপন্যাসিকের হাতে পড়লে নির্ঘাত কয়েকখানা 'সবিনয়ে নিবেদন' এর মতো উপন্যাস তৈরী হোত। আমি অক্ষম, তাই চিঠিগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছি একটা লাল ভেলভেটের বাক্সে। ভবিষ্যতে নাতী-নাত্নীরা পড়ে জানবে ওদের নানা/দাদা ছিলেন কি দারুণ রোমান্টিক আর পরিশীলিত মনমানসিকতার অধিকারী।

যে অমূল্য সম্পদ আমি হারিয়ে ফেলেছি, সেই অসামান্যটুকু হারানোর দুঃখ যে কি তা আমার মতো করে আর কেউ জানবে না। ওনার কাছ থেকে একদিনে নয়, প্রতিদিনের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জেনেছি-একজন স্বামী তার স্ত্রীকে কতখানি মর্যাদা বা সম্মান দিতে পারে। সংসারে ভালোবাসার, বিশ্বস্ততার, সহমর্মিতার কত প্রয়োজন তাও তাঁর প্রেমময় সাহচর্য থেকে জেনেছি। দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে এতটাই নিষ্ঠাবান ছিলেন যে মাঝে মাঝে তাঁকে অতিমানব গোত্রীয় বলে মনে হোত। কারণ আমার চারপাশের অনেক সংসার দেখেছি, দেখেছি স্ত্রী, সংসার এবং সন্তানদের প্রতি তাদের (স্বামীদের) ঔদাসীন্য এবং অবিবেচক মনোভাব। উনি দুঃখ করে বলতেন-একটা পরিবারে যারা সবচাইতে দামী, তাদের মূল্যায়ন না করলে পরিশেষে নিজেই তার মূল্য হারায়।

'To love all in the family, is to show them new ways to grow'- এ কথাটি তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।

hunati.com
Pioneer in village based website

খান সাহেবের অসুখ ধরা পড়ার পেছনে একটা ছোট্ট ঘটনা ছিল। গল্পের মত মনে হলেও ঘটনাটা সত্যি।

সিলেট থাকাকালীন সময় আমার অসুস্থতার কারণে (এলার্জি) রক্ত পরীক্ষা ও অন্যান্য চেকআপ করার জন্য ঢাকা গেলাম। আমার বড় ভাই ডঃ আজীম (বারডেম হাসপাতালের কনসালটেন্ট) সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। উনি আমাকে নিয়ে গেলেন। রক্ত দিতে যে আমি ভীষণ ভয় পাই সেটা তিনি জানতেন। তাই পথে যেতে যেতে আগে থেকেই আমাকে সাহস দিচ্ছিলেন যাতে ওখানে গিয়ে কোন 'সীনক্রিয়েট' না করি। বড়দার ঝকঝকে A.C রুমেই রক্ত নেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। নার্স সিরিঞ্জ হাতে এগিয়ে আসতেই আমি প্রবল আপত্তিতে প্রায় অজ্ঞান হবার উপক্রম। উনি ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গেলেন। আমাকে অনেক অনুরোধ-উপরোধেও কাজ হলোনা দেখে বড়দার মান রাখতে নিজেই হাসতে হাসতে রক্ত দিলেন। শীতল ঘরে বসে আমি তখন ঘামছি। কিছুটা অপ্রস্তুতও। কোন রকমে বাসায় ফিরলাম। আমার চেহারা দেখে সবাই বুঝতে পারল কিছু একটা হয়েছে। উনি কিছুই বল্লেন না, শুধু মিটমিট করে হাসছিলেন। পরে রস ভরে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন কেন অসুস্থ স্ত্রীর বদলে সুস্থ স্বামী তার রক্ত দিয়ে এলেন!! আমার ভাই, বোন, ভাবী ওনার এই উদারতায় সেদিন খুব রাগ করেছিলেন। এতটা প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না, ইত্যাদি ইত্যাদি..........। যাই হোক পরদিন আর রেহাই পেলাম না। রক্ত দিতেই হোল। তখনকি আর জানতাম আমার ভাগ্য লিপিতে লেখা শুরু হয়ে গেছে এক ভয়ঙ্কর দুঃসময়ের আগমনী বার্তা!

কাকতালীয়ভাবে সেদিন উনি যে রক্ত দিয়েছিলেন সেই রিপোর্টেই ভয়াবহ মরণব্যাধি-'লিওকেমিয়ার' প্রাথমিক স্তর ধরা পড়েছিল।

এর পরের ঘটনা অতি দ্রুত ঘটে যেতে লাগল। বড়দা (ডঃ আজীম) আমাদের ব্যাংকক নিয়ে গেলেন। দৌড়াদৌড়ি করে সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করে ব্যাংককের বিখ্যাত সরকারী হাসপাতাল SIRIRAJ এ ভর্তি করলেন। হেমাটোলজিষ্ট ডঃ ওয়ানচাই, ওনার চিকিৎসার ভার নিলেন।

এক দুরন্ত ঝড় গোটা পরিবারের উপর বয়ে যেতে লাগলো। হৃদয়ের রক্ত ক্ষরণের মধ্য দিয়ে এক একটি দিন পার হতে লাগলো বিদেশ বিঁভুইয়ে। যে পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ করে, সেই পরিস্থিতিতে তিনি জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্তে পরিপূর্ণভাবে বাঁচার জন্য সংগ্রামী হয়ে উঠলেন। 'Chemotheraphy' চলতে লাগলো। যা কিনা মানুষের জীবনীশক্তিকে মৃতপ্রায় করে ফেলে। অবশেষে ৩ মাস পর ডাক্তার ঘোষণা করলেন 'ডঃ খান-এর শরীর থেকে লিউকেমিয়ার সেল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে। উনি এখন সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত।' সে দিনের সে খুশীর পরিমাপ করা যায় না। যায় না বিশ্লেষণ করা।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

দেশে ফিরে নতুন উদ্যমে ফিরে গেলেন তাঁর কর্মজগতে। এর মধ্যে ইচ্ছাকৃত বদলি নিয়ে চট্টগ্রামে চলে এলাম। ইউটিলাইজেশন বিভাগে যোগ দিলেন। আমার ছোট্ট সাজানো শ্যামল বাগান আবার আনন্দে মুখরিত হল। ভালো ছিলেন গত ৩ বছর। মাঝে মধ্যে সামান্য জ্বর। গলা ব্যথা ছাড়া তেমন জটিল কোন উপসর্গ দেখা দেয়নি। ইতিমধ্যে আরও বারতিনেক ব্যাংকক গিয়েছি। চেকআপ করে ডাক্তার আশ্বস্ত করেছেন। বলেছেন এভাবে শৃংখলাবিদ্ধভাবে জীবন যাপন করলে উনি আরও অনেকদিন সুস্থ থাকবেন। খাওয়া দাওয়ায় আমূল পরিবর্তন আনা হোল। 'ম্যাকরোবায়োটিক' পদ্ধতি অনুসারে আমীষ ছেড়ে সম্পূর্ণ নিরামিষাসী হয়ে গেলেন। সিগারেট ছাড়লেন। কিন্তু মৃত্যুর সমন যার উপর জারী হয়ে গেছে, তাকে শত চেষ্টায়ও ধরে রাখা যায় না। কোন না কোন অজুহাতে তাকে চলে যেতে হয়।

তেমনি একটি সামান্য অজুহাত হোল দাঁত তোলা। মজবুত দাঁত অথচ ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন তাই একটা ক্লিনিকে গিয়ে দাঁত তুলে আসলেন। অথচ ঐদিন যে দাঁত তুলবেন সেটা আমার জানা ছিল না। আসলে দুর্ভোগ বোধহয় এমনি হঠাৎ করেই আসে। লিওকেমীক রোগীর রক্তপাত সহজে বন্ধ হয় না, তার উপর ডাক্তারের গাফিলতিও ছিল অনেক। কোন ওষুধ না দেয়ার ফলে মাড়ীতে ইনফেকশন সহজেই বাসা বাঁধল। ক্রমশঃ তা জটিল আকার ধারণ করল। আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সবাই পরামর্শ দিলেন ব্যাংকক নিয়ে যাবার। কিন্তু এবারই তিনি সম্পূর্ণ বেঁকে বসলেন (যা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ)। কিছুতেই পরিজন ছেড়ে দেশের বাইরে যেতে রাজী নন। অগত্যা হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালে ভর্তি হলেন। ডাক্তারদের আপ্রাণ চেষ্টায় ৭ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে আসলেন। বুকের ভেতরকার অশুভ চিন্তা দূর হয়ে গেল।

ঢাকা থেকে আগত আত্মীয়-স্বজন (যারা এসেছিলেন উনাকে দেখতে) ওরাও যার

যার সংসারে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হঠাৎ ৩ দিনের মাথায় আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবার অসহ্য পায়ে ব্যথা। যাঁর মুখ থেকে কখনই কষ্টের চিহ্নমাত্র প্রকাশ পেত না (অথবা পেতে দিতেন না) সেই তিনি নীল যন্ত্রণার নির্মমতায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। কোন ওষুধে/ইনজেকশনে ব্যথার এতটুকু লাঘব হোল না। ডাক্তারের নির্দেশে আবার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হোল। ডাক্তারদের আপ্রাণ চেষ্টা বিরামহীনভাবে চলতে লাগলো।

হাসপাতালে মানুষের ঢল। এক নজর তাঁকে দেখবার জন্য ডাক্তারের নিষেধও যেন কেউ মানতে রাজী নন। জীবন সায়াহ্নে এসে তাঁর মনেও যেন এই আকাঙ্খাই প্রবল হয়ে ওঠে-চোখ মেলে দেখতে চেয়েছেন নিকটের, দূরের অনেক অদেখা দরদীদের। হৃদয় দিয়ে ছুঁতে চেয়েছেন তাদের অকৃত্রিম ভালবাসাকে। এঁদের মধ্যে অনেকে রক্ত দিয়েছেন, দিন রাত জেগে নিরলস সেবা করেছেন।

আমার পক্ষে তাঁদের এই ঋণ শোধ করার মত কিছু নেই, শুধু আর্দ্র হৃদয়ে অনুভব করা ছাড়া, কোন ভাষাও পর্যাপ্ত নয় তা ব্যক্ত করার।

জীবনকে গভীরভাবে ভালবেসেই অনায়াসে তিনি মৃত্যু ভয়কে জয় করেছিলেন। তাইতো মৃত্যুর ক'দিন আগে পালন করে গেলেন আমাদের বিবাহ বার্ষিকী।

এ ভাবেই নিভে গেল একজন ক্লান্তহীন জীবন যোদ্ধার জীবন প্রদীপ।

কোথাও কিছু থেমে যায় নি, সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে। আমিও তারই মধ্যে বেঁচে আছি। যা লিখা গেল তার চেয়ে বহু গুণ উহ্য রয়ে গেল ভাষার সীমাবদ্ধতার জন্য, আর তা রয়ে গেল একান্ত আমার হয়ে।

chunati.com Pioneer in village based website

মৃত্যু অমোঘ সত্য। তবু একটি সুখী পরিবারের সবক'টি প্রাণকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে অবেলায় তাঁর চলে যাওয়ায়-বহু সাধনায় 'ভাঙ্গা বীণায়' যে সুর বেঁধেছিলাম-তা যেন মুহূর্তে বেসুরো হয়ে গেল। বদলে গেল জীবনের রং – বেঁচে থাকার আস্বাদ।

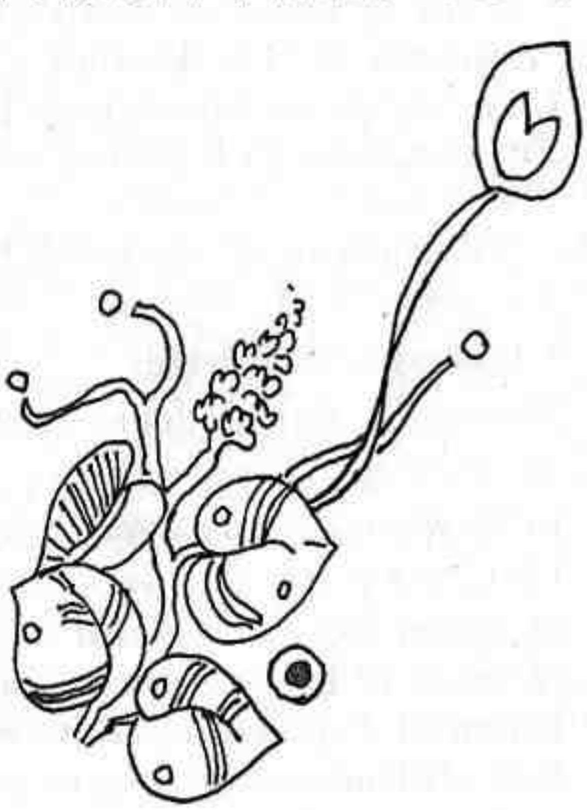

BIO-DATA

NAME : **SHAFIQUE AHMED KHAN**

DATE OF BIRTH : DECEMBER 13, 1937

DATE OF DEATH : JUNE 5, 1992

NATIONALITY : BANGLADESHI

MARITAL STATUS : MARRIED

ACADEMIC QUALIFICATION: Bachelor of Science (B.Sc.), Dhaka University, Dhaka, East Pakistan (now Bangladesh), 1958, in Chemistry (major), Physiology & Zoology.

Master of Science (M.Sc.), Dhaka University, Dhaka, East Pakistan (now Bangladesh), 1960, in Bio Chemistry (Obtained first class and first position in the university)

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS : Bachelor of Science with Honours (B.Sc.) in Foresty of Pakistan Forest Institute, Peshawar University, Peshawar, Pakistan 1963.

* Major subjects - Silviculture and Forest Management.

Doctor of Science (D.Sc.) in forersty Science. University of Sarajevo, Yogoslavia 1982.

* Research thesis (1979-1982) leading to the degree- "Influence of Site Factors and some Physiological Characteristics on various provenaces of Douglas Fir (Pseudotsuga taxifolia)

FIELD OF SPECIALIZATION : Silviculture (Forestry of Exotic and Indigenous Species).

* Professional Forester

MEMBERSHIP : Member, Bangladesh Senior Forest Service Association.

Life Member, Yugoslav Voluntary Society of Foresters.

Member, Editorial Board " Bana Biggyan Patrika" (Journal of Forest Science), Member's International Union of Forest Research Organisations (IUFRO), News Letter.

hunati.com
Pioneer in village based website

EXPERIENCE : Co-ordinator and Team Leader for:
World Bank financed " Mangrove Afforestation Project for Developing Thinning Methodology" in Bangladesh for Forest Department, Government of Bangladesh.
USAID financed " Development of Sui-table Model for Agro-forestry in Bangladesh 1984-1989" for Bangladesh Agricultural Research Council (BARC), Forest Research Institute (FRI) of Bangladesh, Bangladesh Agricultural University (BAU), and Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI).
" Position Paper" to the International Union of Forest Research Organisations (IUFRO) on " Nursery Practices of Tropical Asian Countries" 1984 (was accepted as a model for Bangladesh and other Tropical Developing Countries.)

EMPLOYMENT

1992 TILL DEATH : Conservator of Forest, Eastern Circle, Chittagong, Bangladesh.

1989 - 1992 : Divisional Forest Officers, Forest Utilization Division.

1988 - 1989 : Divisional Forest Officer, Sylhet Forest Div. Service with the Department of Forestry, Ministry of Environment & Forests, Government of Bangladesh. Responsibilites included : Co-ordination, administration, project preparation, field investigations and implementation of various schemes. Implementation of World Bank financed 2nd Forestry project in the capacity of a Project Manager.

1987 - 1988 : Divisional Forest Officer, Mymensingh.

1986 - 1987 : Divisional Forest Officer, Rangamati USF Div. As Project Manager of ADB financed USF Rehabilitation Project.

1983 - 1985 : Chief Silviculturist to the Silviculture Research Division in Forest Research Institute, Bangladesh. Project Leader for research work funded by USAID and IDRC (Canada) on Bamboo Research.

1979 - 1983 : Research training in Yugoslavia, spe-cializing in silviculture and breeding of Douglas Fir.

1977 - 1979 : Forestry Working plan Division, Chittagong. Wrote the "Management Plan of Working Plan for Chittagong Forest Division for 1978-1988".

1976 : Incharge of the Coastal Afforestation Div-ision, Chittagong.
Worked for "Mangrove Ecosystem Project" and successfully developed coastal belt plantation for 5,800 acres (2,347 hectare) in offshore islands of Bangladesh.

1974 - 1976 : With the Forest Research Institute, Chittagong Specialized in wood working and timber engineering.

1972 - 1974 : Incharge of Chittagong Hill-Tracts Division (South) Conservation of Forest Resources.

1968 - 1970 : Incharge of Extension Service Division, Dhaka.
Developed extension and motivation centres for tree planting and afforestation of marginal and wast lands.

1966 - 1968 : As Planning & Technical Officer attached with the office of the Chief Conservator of Forests at Dhaka.
Involved in developing long term Forest Develpment Plans for the country.

1963 - 1966 : Attaached to Chittagong Forest Division as Sub-Divisional Froest Officer (1965-1966) and as Assistant Conservator of Forests (1963-1965).
Administrative and Technical support personnel was involved in forest protection at various centres.

Ghunati.com
Pioneer in village based website

PAPERS AND PUBLICATIONS : "Nursery Practices of Tropical Asain Countries" Position paper presented to the IUFRO planning workshop, Sri Lanka, July 1984 Accepted for publication in the proceedings of IUFRO.

" Problems of Bamboo Seeds in Bangladesh" Read at SEAN/IDRC Symposium, Bangkok, Thailand, May 1984. To be published in the Proceedings of IUFRO.

"Prospects of Acacia mangium for Afforestation in Bangladesh" Pakistan Journal of Forestry, August 1984.

"Influence of Site Factors and some Physiological Characteristics of various Provenances of Douglas Fir (Pseudotsuga taxifilia)"
Doctoral thesis of the auther published as a booklet by the Faculty of Forestry,
University of Sarajevo, Yugoslavia, 1982.

"Working Plans for the Forests of Chittagong Division for the period 1978-79 to 1987-88" Published by the Government of the Peoples Republic of Bangladesh and was adopted for management of forests under Chittagong. Forest Division.

" The Forest Resources of East Pakistan" 1969-70 A brochure published by the then Government of East Pakistan (now Bangladesh), Ministry of Publications and Broadcasting.

The auther had contributed a number of popular and scientific articles on various aspects of forestry, forestry extention, coastal afforestation and wild-life preservation, published in the dailies and broadcasted over radio, in Bangladesh.

VISITS ABROAD : 1961-63 professional Forestry training (leading to degree in Forestry) in Pakistan included extensive tours of arid, semi-arid and hill forests of Pakistan and India.

1979-82 professional training (leading to D.Sc. degree in Forestry Science) under Technical Co-operation Programme in Yugoslavia. Visited alpine and other types of forests in Yugoslavia, Czechoslovakia, Bulgaria, Poland and England.

1984 Represented Bangladesh in ASEAN/IUFRO /IDRC Symposium in Bangkok, Thailand and visited other forest areas of Thailand.

1984 Represented Bangladesh at the IUFRO Reseach Planning Workshop, Srilanka. Presented paper on nursery technique, visited prominent Institutes and forest areas.

1988 Represented Bangladesh Forest Directorate at ICRAF Nairobi KENYA and attended course on Agroforesty for 1 months 15 days and received Certificate.

AWARDS : Special citation and 'Dhaka University Award of Merit' for outstanding results in M.Sc. degree of the University in 1960.

Special citation and award of the 'Gold Pin' by the Faculty of Foresty, Sarajevo University, Yugoslavia in 1982 for outstanding research work.

Certificate on 'Seed Radiography' spon-sored by the International Union of For-estry Research Organisations (IUFRO). Course conducted by the Royal College of Forestry, Stockholm (Sweden) in Bangkok, Thailand in 1984.

স্মৃতি অ্যালবাম ঃ ডঃ শফিক আহমদ খাঁন

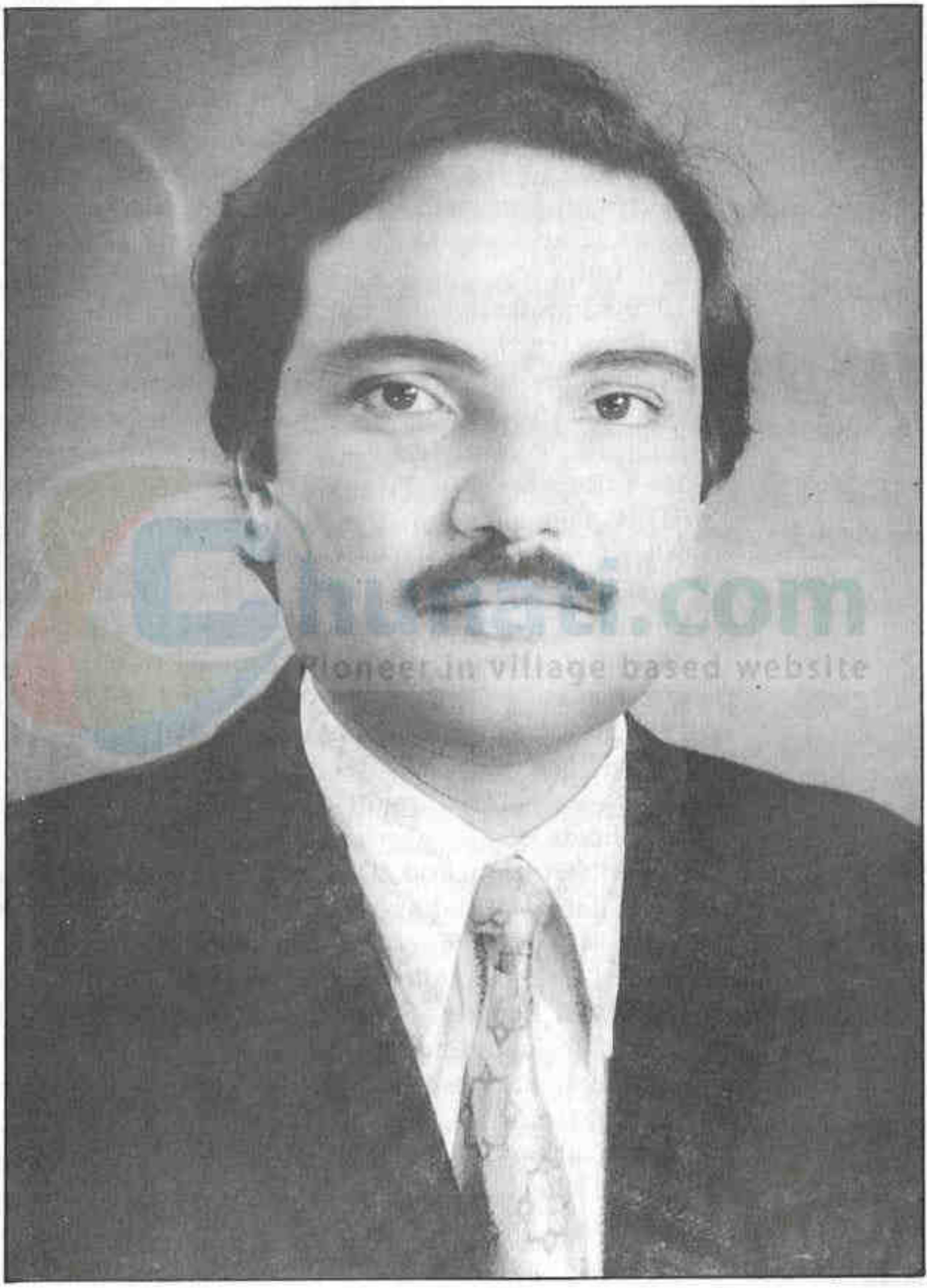

প্রয়াত ডঃ শফিক আহমদ খান

সস্ত্রীক ১৯৭৮

Pioneer in Vlogger Based Website

ডঃ শফিক আহমদ খান

নূরজাহান শফিক

নিয়াজ আহমদ খান (রানা)

নাফিস আহমদ খান (রজত)

শাহনূর আহমদ খান (রনী)

রেহ্‌নুমা খান (দোলা)

জাহীদ আদনান খান (রুবাব)

ব্যাংকক ১৯৮৯

ইন্ডিয়া ১৯৯০

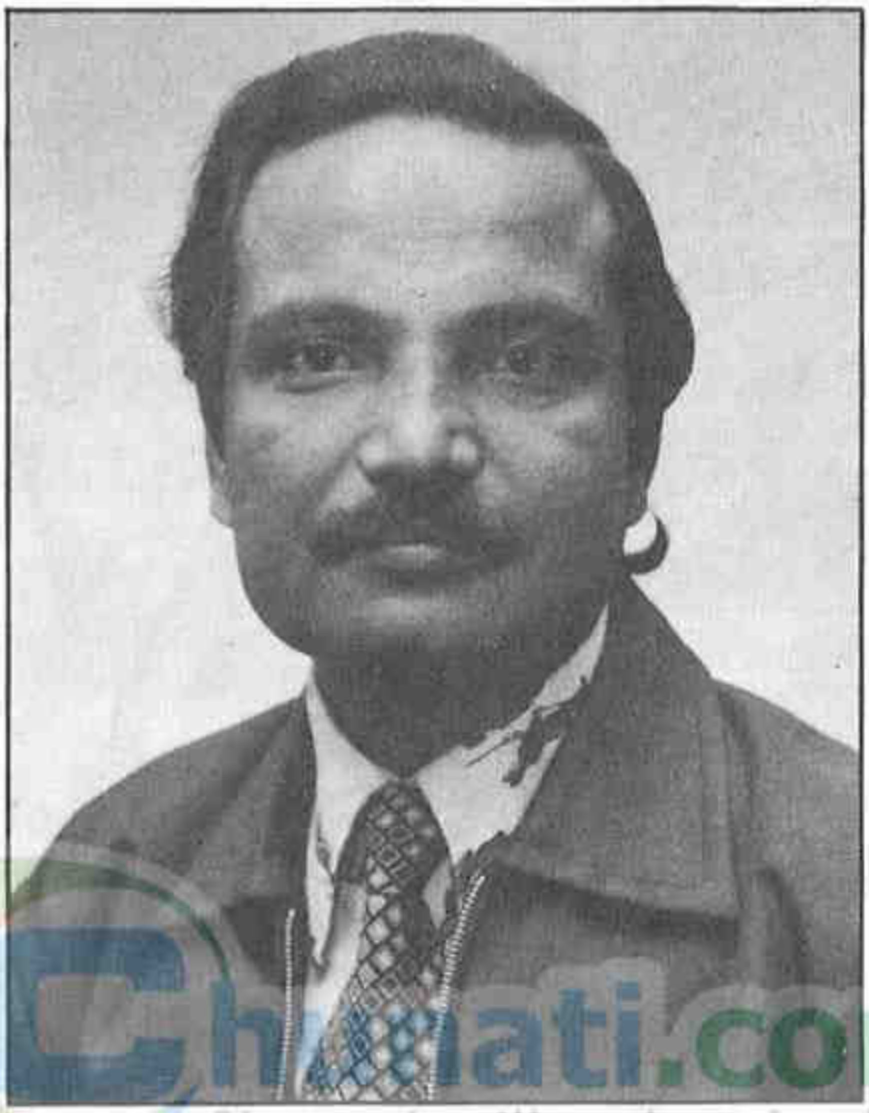

১৯৮৫

সপরিবারে

বিভাগীয় লঞ্চ 'বনরাণী'তে (সুন্দরবন, খুলনা)

ঈদের দিন, সিলেট

বেগম সুফিয়া কামাল ও পরিবারের অন্যান্যদের সাথে

১৯৯০ সিলেট

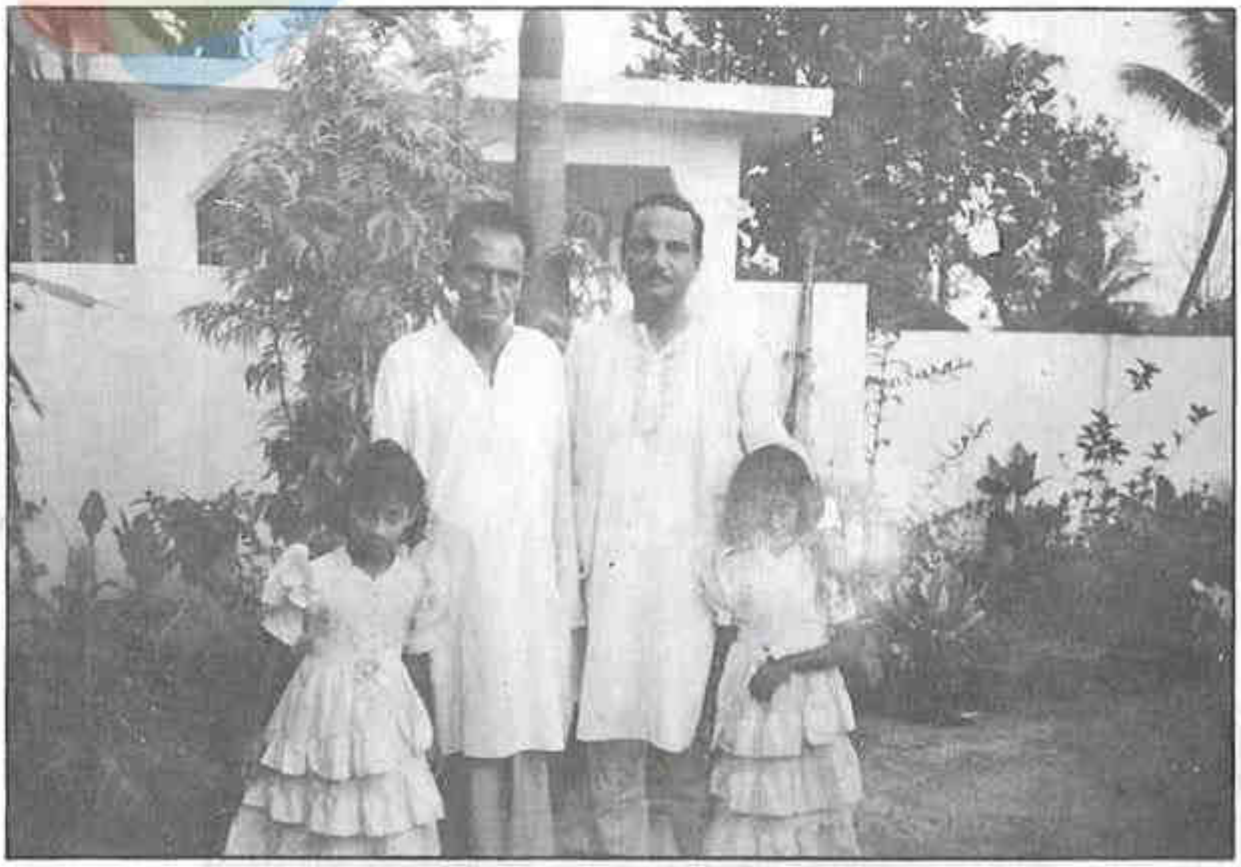

জনাব আসহাবুদ্দিন সাহেবের সাথে ১৯৯২

১৯৬৩

১৯৭০

যুগোশ্লাভিয়া ১৯৭৯

যুগোশ্লাভিয়া ১৯৮০

সিলেট বাংলোর সামনে ১৯৯০

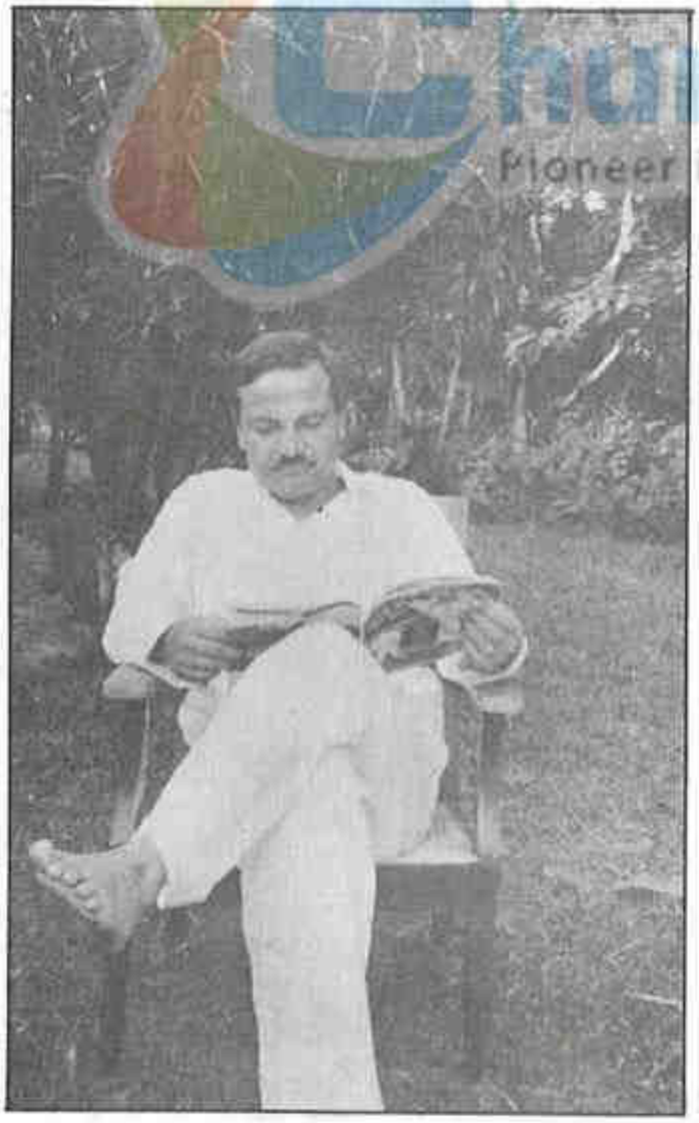

বন গবেষণাগার ১৯৮৮

ইন্ডিয়া ১৯৯১

বুলগেরিয়া ১৯৮২

রুমানিয়া ১৯৮২

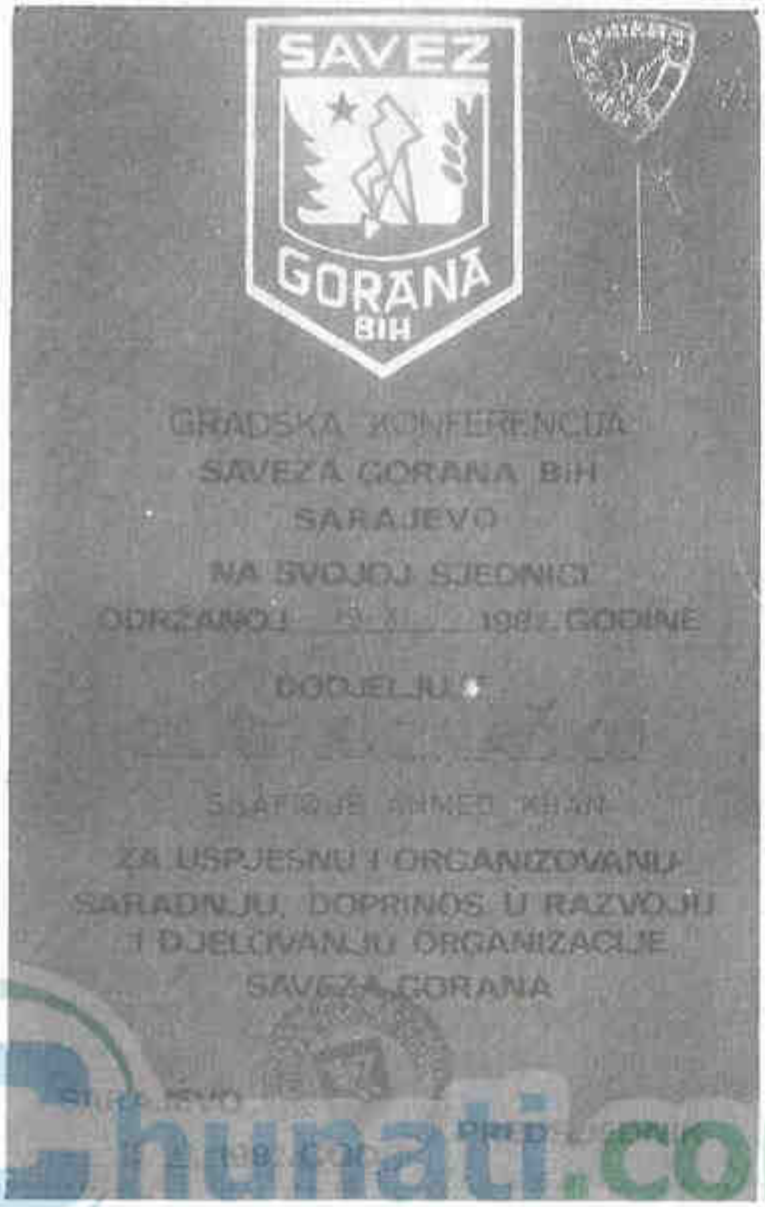
SAVEZ GORANA BIH

GRADSKA KONFERENCIJA
SAVEZA GORANA BIH
SARAJEVO
NA SVOJOJ SJEDNICI
ODRŽANOJ [illegible] GODINE
DODJELJUJE
[illegible]
SHAFIQUE AHMED KHAN
ZA USPJESNU I ORGANIZOVANU
SARADNJU, DOPRINOS U RAZVOJU
I DJELOVANJU ORGANIZACIJE
SAVEZA GORANA

SARAJEVO
PREDSJEDNIK

Pioneer ... based website

লাইফ মেম্বার সার্টিফিকেট
যুগোশ্লাভ ভলেন্টারী সোসাইটি অব ফরেষ্ট

যুগোশ্লাভিয়ার সারায়েভো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'গোল্ড পিন' প্রদান

প্রফেসর ভ্লাদিমির ও প্রফেসর নেদা'র সাথে সারায়েভো বিশ্ববিদ্যালয়, যুগোশ্লাভিয়া

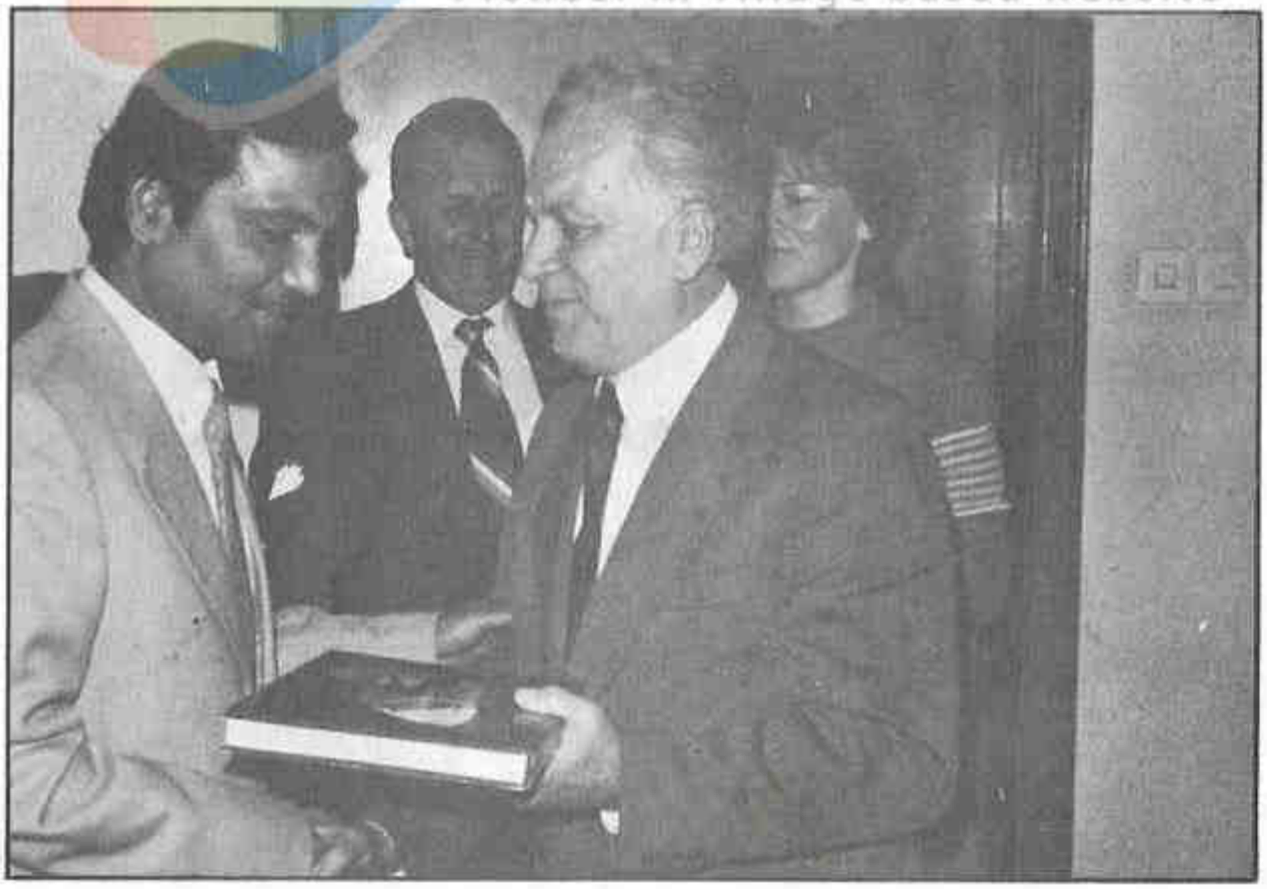

পি.এইচ.ডি ডিগ্রী প্রদান করছেন প্রফেসর পিন্‌তারীচ্‌ সারায়েভো বিশ্ববিদ্যালয়,
যুগোশ্লাভিয়া, ১৯৮২

PLANNING WORKSHOP FOR ASIA ON
FOREST RESEARCH & TECHNOLOGY TRANSFER

প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ, শ্রীলঙ্কা

লন্ডন বাকিংহাম প্যালেসের সামনে ১৯৮২

কেনিয়া, নাইরোবী ১৯৯১

IUFRO.ASEAN-CANADA FOREST TREE SEED CENTRE
IDRC.FAO.RFD.FID.TPC AND KU
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
SEED QUALITY OF TROPICAL AND
SUB-TROPICAL SPECIES
GKOK.22-26 M 984

ইউফ্রো কনফারেন্স, ব্যাংকক ১৯৮৪

মধুপুর জঙ্গল, ময়মনসিংহ

চাইনিজ বিশেষজ্ঞের সাথে এফ,আর,আই বাঁশবাগানে

ফিল্ডওয়ার্কে, কেউচিয়া বন রেঞ্জ, চট্টগ্রাম

বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাথে, বন গবেষণাগার, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

মেজর জেনারেল নূরুদ্দিন ও বন সংরক্ষক জনাব আলীম সাহেবের সাথে
বন গবেষণাগার, চট্টগ্রাম, ১৯৮৭ সন

বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদ্বোধন, ময়মনসিংহ

বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন

সিলেট বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন

সেমিনারে বক্তৃতারত, রাঙ্গামাটি

ডঃ ওয়ানচাই'র সাথে সিরিরাজ হাসপাতাল, ব্যাংকক

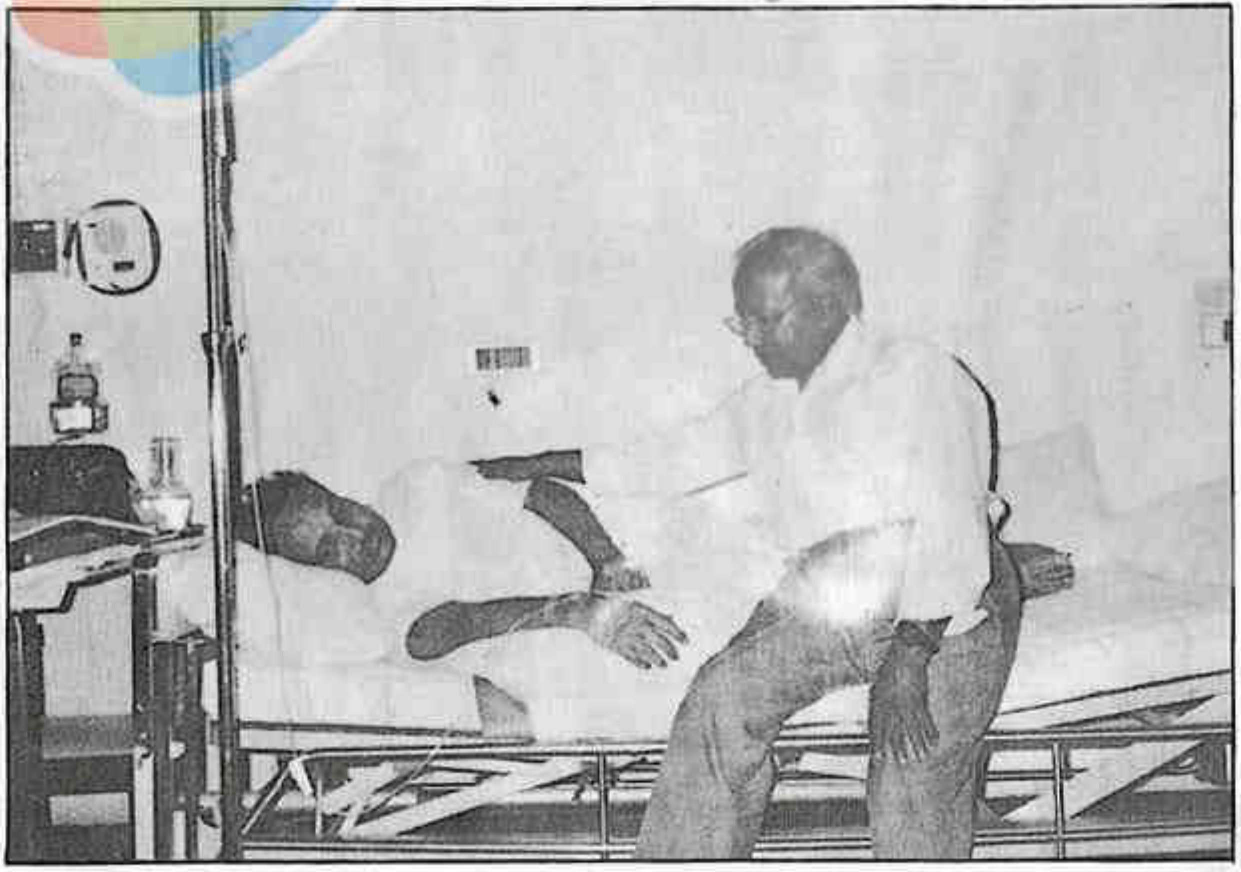

ডঃ আজীমের সাথে সিরিরাজ হাসপাতাল, ব্যাংকক

হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালে শেষ বিবাহ বার্ষিকী উদ্‌যাপন

হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালে মৃত্যু–শয্যায় শায়িত

হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালে মৃত্যুর ৩ দিন পূর্বে

'স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি'

'চুনতীর পারিবারিক গোরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত
৫ই জুন ১৯৯২ সাল রোজ শুক্রবার
২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯ বাংলা, ৩রা জিলহজ্ব ১৪১২ হিজরী